ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯



আই এফ এ শিল্ড



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান : অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



লিগে ইস্টবেঙ্গল ঃ এরিয়ান / সমর তরফদার

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ।। সংখ্যা ১৯ ।। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

আই এফ এ শিল্ড প্রতিযোগিতা নিয়ে গোড়ার দিকে যেরকম জল্পনা কল্পনা হয়েছিল দেখা গেল শেষ পর্যন্ত কিছুই ধোপে টিকল না। অর্থাৎ ভাল রকম ধোলাই পর্বের পর সেই পুরাতন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ফাইনালে পৌঁছে গেল। ফাইনালের ফলাফল নিয়ে তারাই মাথা ঘামাবেন যারা রেকর্ড রাখতে ভালবাসেন, জয়পরাজয় নিয়ে অনেকদিন ধরে তারিয়ে তারিয়ে আলোচনা করে সুখ পান।

এবারে পশ্চিম এশিয়ার পেট্রোল-সমৃদ্ধ ক্ষুদ্ররাষ্ট্র কুয়েত থেকে কাজমা স্পোর্টস ক্লাব এবং দূরপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি দল এলেও তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। কাজমা ক্লাব প্রথমদিনই ভিজে মাঠে স্থানীয় বি এন আর দলের কাছে কাবু হয়ে যায়। দক্ষিণ কোরিয়া প্রথম খেলায় চমক সৃষ্টি করলেও সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে টাইব্রেকারে পরাজিত হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং কাজমা ক্লাবের বদলে বি এন আরকে কোয়ার্টার ফাইনালে সহজে পরাজিত করলেও সেমিফাইনালে মোহনবাগানের কাছে মিইয়ে যায়। অনেকে আশা করেছিলেন যে মহমেডান স্পোর্টিং অঘটন ঘটালে ঘটাতেও পারে।

বিদেশী দু একটি দল এলেও ভারতের অন্য রাজ্য থেকে নামকরা কোন দল বেশ কয়েক বছর না আসার ফলে আই এফ এ শিল্ড প্রতিযোগিতা যে বর্ণহীন হয়ে পড়েছে একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হচ্ছে অন্য রাজ্যের দল না আসার কারণ হিসেবে। যেমন দারুন বর্ষা, নরম মাটি, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ইত্যাদি। হয়ত কিছুটা সত্যি।

কিন্তু কলকাতার অনেক বদনামের মধ্যে ফুটবল খেলার দর্শকদের 'ভয়াবহ' আচরণ একটা বড় কারণ বলে অনেকে মনে করেন। এই বদনাম ঘোচাতে পারেন একমাত্র দর্শক ও বড় ক্লাবের সমর্থকরা। অবশ্য তারা যদি শুধুই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে পছন্দ করেন তাহলে আর কোন কথা ওঠে না। অর্থাৎ শিল্ড যেমন চলছে সেই রকমই চলবে। বিজয়ী দলকে আমরা অভিনন্দন জানালাম।





যা আছে

প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন : সমর তরফদার

অন্যান্য ছবি : পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস ও অন্যান্য।

সম্পাদক : অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা : ১·৫০

বিমান মাশুল :
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



টেস্টে নেমেই ৬টি উইকেট—দিলীপ দোশি এদেশে দ্বিতীয় নজীর



সুব্রত সরকার ঃ কুড়ি ওভার বল করে ৪১ রানে পাঁচ উইকেট। মাদ্রাজ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে এমনই ছিল দিলীপ দোশির বোলিং হিসাব। পাঁচটির বদলে যদি সেদিন তার বরাতে মাত্র দুটি উইকেট জুটত, তাহলে ব্যাপারটা কিছুটা অন্যরকম হয়ে যেত বটে। অনেকেই মন্তব্য করত, ইয়াং প্লেয়ারদেরই চান্স দেওয়া উচিত—দোশির তো বেদীর সমানই বয়স। নির্বাচকমণ্ডলীতে উত্তরাঞ্চলের সদস্য হয়ত বলতে বাকি রাখতেন না, হানস কো টিম-মে আনা চাহিয়ে। আর খেলার আসরের সম্পাদকও দোশির উপর ফিচার চাইতেন না। অনেক বোনেরাই জানতে চাইল, এই দোশি কি পাঞ্জাবি, না মাড়োয়ারী?

দিলীপ দোশির মাতৃভাষা গুজরাটি, তার জন্মও গুজরাট রাজ্যের রাজকোট শহরে। ১৯৪৭ সালের ২১ ডিসেম্বর। তবে বহুদিন ধরেই সে কলকাতাবাসী। বাড়ি ভবানীপুরে, লেখাপড়া, খেলা শেখা সবই কলকাতায়, বাঙ্গলাও যথেষ্ট ভাল বলতে পারে। প্রায় বারো বছর ধরে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলছে, গতবার কর্নাটকের বিরুদ্ধে দলের অধিনায়কও হয়েছিল। তাই তাকে বাঙালী বলতে বাধা কি?

প্রথম টেস্ট ইনিংসে ছ'টি উইকেট আবিদ আলিও নিয়েছিল। সেটি ১৯৬৭-৬৮'এর ঘটনা। তবে তারপর আরও ২৮ টেস্ট খেলে আবিদ আর মাত্র ৪০টি উইকেট পায়। টেস্টে প্রথম বোলিং-এর সুযোগে পাঁচটি উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ নিসার, ১৯৩২-এর লর্ডস টেস্টে প্রথম ইনিংসে তার ফিগার ছিল ২৬-৩-৯৩-৫। স্পিন বোলারদের মধ্যে টেস্ট ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নিয়েছিলেন মাদ্রাজের লেগ-ব্রেক বোলার ভমন কুমার পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫-৬৪, তবে প্রসন্ন-বেদী-চন্দ্রশেখর-ভেঙ্কটরাঘবনের কেউই দোশির মতন এমন সাফল্যের সঙ্গে টেস্ট জীবন আরম্ভ করেনি।

দোশি বাংলার হয়ে প্রথম খেলে ১৯৬৮-৬৯'এ। দলীপ ট্রফিতে নিয়মিত পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার নির্বাচকরা এবারেও তাকে রেস্ট অফ ইণ্ডিয়ার হয়ে ইরানী ট্রফিতে খেলবার সুযোগ দেয়নি। রঞ্জি ক্রিকেটে দোশি ১৯৭৭-'৭৮-এ'ই ২০০ উইকেটের গণ্ডি পার হয়ে গেছে—বাংলার রেকর্ড।

দিলীপ দোশির বিরুদ্ধে এই ক'বছরে নানারকম অভিযোগও শোনা গেছে। এক সময়ে বলা হত, ব্যাটসম্যানরা তার বোলিং বেশি আক্রমণ করলে দোশি তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলত, মাঝে-মধ্যে সামান্য আহত বলে মাঠ থেকেও বেরিয়ে যেত। এক বিশেষজ্ঞ একবার বুঝিয়েছিলেন, দোশির বোলিং-এ ভ্যারাইটির অভাব, সে বড় এক-গুঁয়ে ঃ সেই ব্যাটসম্যানকে ফ্লাইটে ঠকানো যেতে পারে তাকে সমানে চেষ্টা করে যাবে স্পিনে আউট করতে, চাইবে রাউণ্ড-দ্য-লেগ বোল্ড করতে। আবার আরেকজনের মতে তার ফিল্ডিং এত দুর্বল, টেস্ট দলে তাকে নেওয়া সত্যিই মুস্কিল।

তবে বাংলার ক্রিকেটারদের অধিকাংশই মনে করে, শেষ দশ-বিশ বছরে দোশির মতন স্পিনার এ রাজ্যে আর হয়নি। ন্যাটা স্পিনার হিসাবে তার রেকর্ড যথেষ্ট ভাল। হতে পারে বোম্বাইয়ের পদ্মাকর শিভালকরের রঞ্জি রেকর্ড আরও নজরে পরবার মতন, তবে শিভালকর যেমন ফিল্ডিং সাপোর্ট পেয়ে এসেছে দোশি তা কখনই পায়নি।

ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে বটে, দিলীপ দোশি আর সুব্রত গুহ একসঙ্গে আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে সেণ্ট জেভিয়ার্সের হয়ে খেলত। সুব্রত শেষ টেস্ট খেলেছে দশ বছর আগে, এখন রঞ্জি দলেরও বাইরে। আর দিলীপ দোশি সবে প্রথম টেস্টে খেলবার সুযোগ পেল। সুব্রত'র সঙ্গে ১৯৬৯'এর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকতা টেস্টে খেলেছিল অম্বর রায়। তারপর ৪৯টি টেস্ট ম্যাচে বাংলার কোন প্লেয়ার ভারতীয় একাদশে আসতে পারেনি।

দিলীপ দোশি ১৯৭৬-এ হারফোর্ডশায়ারের হয়ে ইংলিশ মাইনর কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবার পর '৭৭-এ নিয়মিত নটিং-হ্যাম-শায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলে। সেবার পেয়েছিল ৮২টি উইকেট; ১৯৭৮-এ ১৫টি খেলায় নেয় ৬০ উইকেট।

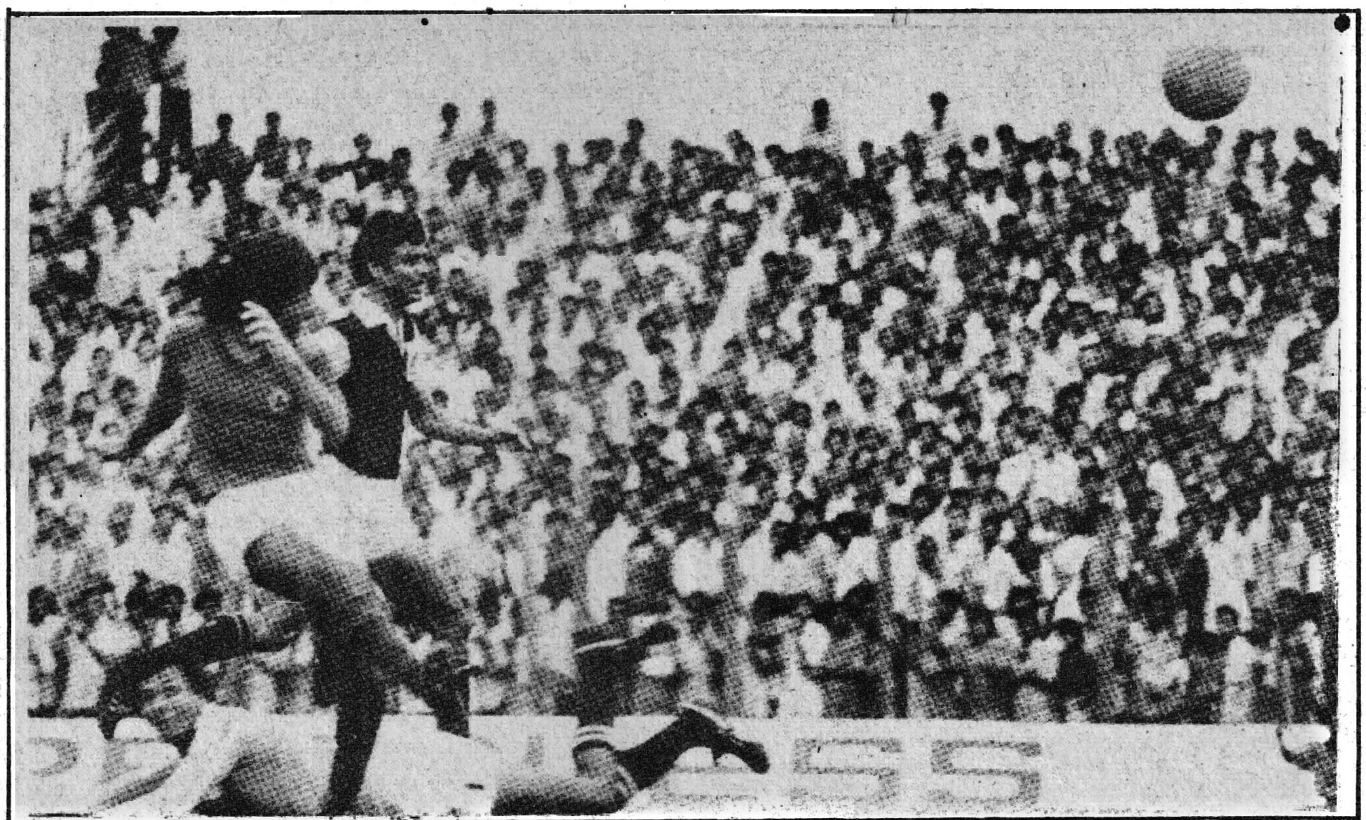
ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে গতবছর দোশিই একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় ছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশত নটিংহ্যামশায়ার তাকে '৭৮-এর পর আর দলে রাখতে পারল না। ১৯৭৮ সিজনের মুখে কাউন্টি ক্লাব হঠাৎ ঠিক করে কাউন্টি ক্যাপ্টেন ক্লাইভ রাইসকে তারা আর দলে রাখবে না। রাইস দক্ষিণ আফ্রিকার অল-রাউণ্ডার, প্যাকার ক্রিকেটে খেলে। রাইসের বদলে নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট অল-রাউণ্ডার রিচার্ড হ্যাডলির সঙ্গে চুক্তি সই করল। রাইস প্যাকারের সাহায্যে কোর্টে কেস ফাইল করল কাউন্টি কমিটির বিরুদ্ধে। কাউন্টি ক্লাবের কর্মকর্তারা যখন বুঝলেন আইনের চোখে রাইসকে সত্যিই অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, নতুন সিদ্ধান্ত নিল রাইসকে ফিরিয়ে নেওয়ার। এতে মুস্কিল হল দোশির, কারণ বর্তমান কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুসারে একসঙ্গে দু'জনের বেশি বিদেশী প্লেয়ার এক দলে খেলতে পারে না। হ্যাডলি ১৯৭৮ সিজনের পরের দিকে যখন ইংল্যাণ্ড সফরকারী নিউজিল্যাণ্ড দলে যোগ দিল, তখন দোশি নটিংহ্যামের হয়ে খেলতে পারল। তবে সিজনের শেষে কাউন্টি কমিটি ঠিক করল, রাইস, হ্যাডলিকে রেখে তারা দোশিকেই ছেড়ে দেবে—কারণ ইংল্যাণ্ডে স্পিনারদের থেকে পেস বোলার, উপরন্তু অল-রাউণ্ডারদের দাম অনেক বেশি।

এবছরও কিন্তু দোশি ইংল্যাণ্ডে খেলেছে। আবার মাইনর কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে—এবার নর্থাম্বারল্যাণ্ডের হয়ে। এবারকার ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় স্পিনারদের মরচে পড়া বোলিং দেখে অনেক সময়েই মনে হয়েছিল, দোশি মাইনর কাউন্টির বদলে যদি ভারতীয় দলের হয়ে খেলত, বেশ তফাৎ হত।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দোশি মাদ্রাজ টেস্টের প্রথম ইনিংসের ছটি উইকেট সমেত পেয়েছে মোট ৪৯৮ উইকেট। তবে হিসাবের সামান্য এদিক-ওদিক হতে পারে, কারণ এদেশে কটি ম্যাচ ফার্স্ট-ক্লাস কিনা সেটি সামান্য বিতর্কের ব্যাপার।

শেষ বছর দুয়েক ধরেই শোনা গেছে, দোশি চাইছে সৌরাষ্ট্রের হয়ে রঞ্জি খেলতে। তবে সে টেস্ট প্লেয়ার হল বাংলার খেলোয়াড় হিসাবেই।

মোহনবাগান ঃ মহমেডান স্পোর্টিং—পায়াসের তৃতীয় গোল, পাশে সমরেশ চৌধুরী, মাটিতে নাসির আমেদ/পাহাড়ী রায়চৌধুরী



মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মহমেডান স্পোর্টিং-এর দাপট দেখা যায়নি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ যেমন হাঁকডাক ছিল মহমেডানের তার কিছুই জাহির হয়নি ১২ সেপ্টেম্বরে সেমিফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলাটিতে। লিগ ম্যাচে বড় দুই প্রধানের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং লড়েছিল ভালই। শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালেও তারা পরিচ্ছন্ন খেলে জয়ী হয়েছিল বি এন আরের বিরুদ্ধে।

এই মহমেডানকে একদম নাজেহাল করল মোহনবাগান সেমিফাইনালে, একটু গুছিয়ে আক্রমণ এবং গোল করার ইচ্ছা তীব্র থাকলে ফরোয়ার্ডরা অনেক বেশি গোল পেতে পারত। শেষ কুড়ি মিনিট মহমেডান স্পোর্টিং কেবল ফুঁসে উঠেছিল এবং দীনকর মারফতে একটা গোল পেয়ে ব্যবধান ১-৩ করে।

কোচ অমল দত্ত শুরুতেই সমরেশকে চার-ব্যাকের পেছনে সুইপার খেলান মোহনবাগান আক্রমণকে রোখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানস শ্যাম ও পায়াসের যুগপত হানায় বিব্রত হয়ে পড়ে মহমেডান ডিফেন্স। গোটা ম্যাচটায় গৌতমের ডাইনে-বাঁয়ে, উঠে-নেমে খেলাতেই মোহনবাগান ফরোয়ার্ডরা সতেজ হতে পেরেছিল বেশি।

চার মিনিটের মধ্যেই মোহনবাগান গোল পায় এবং তাতেই মহমেডান খেলোয়াড়রা ডীফেনসিভ খেলাতেই মন ঢালে। সমরেশ সুইপারের ভূমিকায় থাকায় মাঝমাঠে তাদের দুর্বলতা আরো প্রকট হয়। ফলে ফরোয়ার্ডদের বল পাবার ঘাটতিতেই বিপক্ষ ডিফেন্সে বড় বেশি হানা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

ডানদিক থেকে মানসের ব্যাক পাস পেয়ে গৌতম ধেয়ে যায় এবং গৌরাঙ্গকে ডজ করে গোলমুখে সেণ্টার করতেই শ্যামের হেডে গোল হয় (১-০)। নাসির তখন ঠিক জায়গায় ছিল না।

মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলও হয় নাসিরেরই ভুলে। তখন চল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। মাঝমাঠ থেকে প্রদীপ চৌধুরীর সট ধনুকের মত এসে পাক খেয়ে গোলে ঢোকে নাসিরের হাত ছুঁয়ে (২—০)। নাসির ঠিকমত ফ্লাইটের হিসেব না করাতেই বল গোলে ঢোকে।

অথচ প্রথম গোলের পরেই প্রসূন যখন মাঝমাঠ থেকে বল ঠেলে দেয় পায়াসকে এবং সে ঠিক পেনাল্টি বক্সের ঠিক বাইরে থেকে তীব্র সট নেয়, তখন নাসির চকিতের ডাইভে বল পাণ্ড করে। এটি দর্শনীয় ছিল।

দ্বিতীয় গোলের মিনিট দুই আগেও মানসের শক্ত সট ধরে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়।

মোহনবাগান তৃতীয় গোল করে পায়াসের মারফতে। মানসের সেণ্টার ধরে পায়াস জোরালো ভলিতে গোল পায় (৩—০) খেলার চুয়ান্ন মিনিটে। দশ মিনিট বাদেই পায়াসের আরো একটা ইনসুইং সট নাসির বাঁচায় ফিস্ট করে।



বলের দখল নিয়ে লড়াই, প্রদীপ চৌধুরী ও সমরেশ চৌধুরী/শংকর

দ্বিতীয়ার্ধের চৌত্রিশ মিনিটে মহমেডান একটি গোল করে। ওভারল্যাপ করে গৌরাঙ্গ সেণ্টার করতেই মাথা ঠেকিয়ে দীনকর গোল পায় (১—৩)।

মোহনবাগান ঃ প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ও শ্যামল ব্যানার্জি ; গৌতম সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জি ; মানস ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, জেভিয়ার পায়াস ও বিদেশ বসু।

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ নাসির, ফিলিপ, মঈদুল, অশোক চক্রবর্তী ও গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি ; সমরেশ চৌধুরী ও অমলরাজ ; লতিফুদ্দিন, নাজিব (সুভাষ রায়), হাবিব ও দীনকর।

রেফারি ঃ এস এস হাকিম।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল অনেক সহজে জিততে পারত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ১১ সেপ্টেম্বর শেষ পঁয়ষট্টি মিনিট একটানা দাপটে খেলেও আর গোল না পাওয়ায় ইস্টবেঙ্গলকে আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে উঠতে হয়েছে টাইব্রেকারে জিতে। দক্ষিণ কোরিয়া প্রথমে গোল করে এবং পরে ১-১ করে ইস্টবেঙ্গল সুরজিতের চমৎকার গোলে। টাইব্রেকারে দক্ষিণ কোরিয়ার দু'টি সট ব্যর্থ হওয়ায় ফল হয় ৪-৩ ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে। ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় সটে গোলের সুযোগ হারায় ডেভিড মারফতে।

ডেভিড উইলিয়ামস চমৎকার দু'টি গোলের সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ না হলে ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে যেতে হতো না। প্রথমটি ডেভিড একা গোলকিপারকে পেয়েও বাইরে মারে। দ্বিতীয়টায় অবশ্য ডেভিডের থেকে অনেক বেশি কৃতিত্বের দাবি রেখেছে কোরিয়ার গোলকিপার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় বলটি গ্রিপ করে।

দুর্ভাগ্য ইস্টবেঙ্গলের অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতেই হরজিন্দার থেকে সেণ্টার পেয়ে মনজিতের হেড এক ডিফেণ্ডারের গায়ে লেগে পৌঁছয় সুরজিতের কাছে। কোরিয়া গোলকিপার তখন পজিশনে ছিলেন না। সুরজিতের তীব্র সটটি আঘাত হানে পোস্টে।

টাইব্রেকারে পৌঁছবার আগেই ইস্ট-বেঙ্গলের ৩—১ গোলে জয় পাওয়া উচিত ছিল।

প্রথম পঁয়ত্রিশ মিনিট ইস্টবেঙ্গলকে প্রায় নাস্তানাবুদ করেছিল কোরিয়ার খেলোয়াড়রা। রাইট আউট হং সুপ কিম, লেফট আউট তাই বং হাকে আক্রমণ গড়তে ভালো সহযোগিতা দিল লেফট হাফ সাং জেং চো ও রাইট ব্যাক জাং য়ুন হাং। ছোট ছোট মাপা পাসে তারা মুহুর্মুহু আক্রমণে তেড়ে এলো ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স এরিয়ায়।



ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলায় আহত দক্ষিণ কোরিয়ার উন চুল জং/অরুণ মুখার্জি

শুরু থেকে শেষ মনোরঞ্জনের এদিনও দাপট ছিল আগের আগের বড় খেলাগুলোর মতো। সত্যজিতের অভাব অনুভব হয়নি ম্যাথুজের চমৎকার এ্যান্টিসিপেশন এবং ঠিক সময়ে সুন্দর ট্যাকলিং দ্বারা সতর্ক হয়ে খেলার ফলে। অন্যদিনের থেকে উজ্জীবিত ভূমিকা নিলেও গুরদেবের কয়েকটি এলোমেলো লম্বা কিক এবং মিস পাস দৃষ্টি কটু ছিল। একটা মিসকিক তো প্রায় বিপদ ডেকে এনেছিল।

ইস্টবেঙ্গলের মস্ত ঘাটতি ছিল সেদিন মূলত মাঝমাঠের জন্য। দ্বিতীয়ার্ধে কাজলের পরিবর্তে নেমে মনজিত আক্রমণের দায়িত্ব নেয়। মাঝমাঠে নেমে এসে মিহির সুবিধা করতে পারেনি।

মনজিত উঠে নেমে আক্রমণকে সতেজ করেছে। ওর মাপা পাসগুলি পেয়েও ডেভিড বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন খেলেছে হরজিন্দার। তবে শেষদিকে তার লম্বা সেণ্টারগুলি জায়গা মতো পৌঁছলে অনেক সুবিধা হতো।

দ্বিতীয়ার্ধে সুরজিত ছিল কিছুটা নিষ্প্রভ। তবে তার যে গোলটিতে ইস্টবেঙ্গল ১-১ করে তা বহুদিন মনে রাখার মতো। একেবারে আন্তর্জাতিক মানের। এমন গোল এখন গড়ের মাঠে কেবল সুরজিতের পক্ষেই সম্ভব।



ইস্টবেঙ্গল ঃ দক্ষিণ কোরিয়া॥বল নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরজিত ও হান মুন বে,গোলরক্ষক কিম ডাক গিল (২১) বলটি আয়ত্তে আনতে চাইছে/অরুণ মুখার্জি



বার বার ব্যর্থ ডেভিড উইলিয়মস মাটিতে মাথায় হাত দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার গোলের মধ্যে/শংকর

প্রথম বিশ মিনিট ঘন ঘন আক্রমণে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ যখন বিব্রতবোধ করছিল, তারপরেই কোরিয়ানরা গোল পায়। একটা সম্মিলিত আক্রমণ থেকে রাইট আউট হং সুপ কিমের তীব্র সটে প্রথম গোল হয়। আচমকা 'ডিপ' সটে ভাস্করের করার কিছুই ছিল না।

ইস্টবেঙ্গলের গোল শোধের কৃতিত্ব সম্পূর্ণই সুরজিতের। মাঝমাঠ থেকে চিন্ময়ের পাস পেয়ে ঠেলে দেয় মিহিরকে। তারপর সে জায়গা নেয় ছুটে গোল লাইনের কাছে। মিহিরের পাস ধরে আগুয়ান দুই ডিফেণ্ডারের একজনকে অনায়াসে ডজ করে দ্বিতীয়জনকে ফাঁকি দেয় বুদ্ধি খরচা করে। প্রথমে সে আউট সাইড ডজের ভঙ্গি নিয়েও হিল দিয়ে বল স্টপ করে ডিফেণ্ডারকে পেছনে ফেলে। এবং ডান পায়ের সোয়ার্ভিং সটে গোল পায় (১-১)।

অতিরিক্ত সময়ের শেষ দশ মিনিটেও ইস্টবেঙ্গল কোরিয়া ডিফেন্সকে নাজেহাল করে। কিন্তু গোল পায়নি।

টাইব্রেকারেও ডেভিড ব্যর্থ হয়। বাকী চারটি পেনাল্টি সটে গোল পায় চিন্ময়, হরজিন্দার, গুরদেব ও মনজিত।

কোরিয়ানদের প্রথম পেনাল্টি সটটি রুখতে ভাস্করের বড় অবদান ছিল। মুন বে হানের পর ভাস্কর আরও একটি সট বাঁচায় সাং জেং চোই-এর করা সবশেষটি।

আই এফ এ শিল্ডে এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল পঁচিশবার ফাইনালে উঠলো। শিল্ডে বিদেশী দলগুলোকে রুখে দেবার পুরনো ঐতিহ্যে ফের ফিরে এলো ইস্টবেঙ্গল। গতবছর তারা সেমি-ফাইনালে হেরেছিল আরারাতের কাছে।

মাঠে ঢোকার মূল গেটে কোন্ পুলিস অফিসার সেদিন দায়িত্বে ছিলেন? সাধারণ গ্যালারির দর্শকদের হরদম ফেনসিং-এর ভেতরে ঢুকতে দিয়ে বারে বারে তিনি বাধা দিয়েছেন বিশেষ বিশেষ লোকজনকে।

লাঠি চার্জ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল প্লেয়াররা যখন মাঠে প্রবেশ করে তার একটু আগে। স্পোর্টস কাউন্সিল সেক্রেটারি, কয়েকজন সাংবাদিককে হেনস্থা করা হয়। হেনস্থা হতে হয় ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদেরও।

কর্তব্যরত সাংবাদিকরা প্রেস কার্ড দেখালেও তিনি হম্বিতম্বিতে তাদের গেট থেকে ফিরিয়ে দেন।

ইস্টবেঙ্গল: ভাস্কর, চিন্ময়, মনোরঞ্জন, গুরদেব ও ম্যাথুজ, প্রশান্ত ও ক.. গ (মনজিত), সুরজিত, ডেভিড, মিহির ও হরজিন্দার।

দক্ষিণ কোরিয়া: ডাক গিল কিম, জাং য়ুন হাং, মুন বেই হান, চুল সো কিম ও য়ুন হো লী, জং সুক শোন ও সাং জেং চেই, হং সুপ কিম, চাল জাং য়ুন (তাই ইয়ং জো), কোয়াং সান লী (কি সুক লী) ও তাই বং হা।

রেফারি: এস এস হাকিম।

মহমেডান স্পোর্টিং সেমিফাইনালে

স্টাফ রিপোর্টার: কোয়ার্টার ফাইনালে ১০ সেপ্টেম্বর বি এন আরকে তিন গোলে হারিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ৭৯-র শিল্ডের সেমিফাইনালে গেল। গতবার ওরা কোয়ার্টার ফাইনালে আরারাতের কাছে ০-৪-এ হেরেছিল। আগেই লিখেছি, এবছরের লিগের শেষদিকে অমল দত্ত কোচ হবার পর মহমেডানের শক্তি অনেক সংহত এবং উন্নত হয়েছে।

এদিন বি এন আরকে হারাতে ওদের তেমন বেগ পেতে হয়নি, যদিও বি এন আর মাঝে মাঝে পাল্টা আঘাত হেনেছে এবং লড়বার চেষ্টা করেছে। তবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কাস্টমস-র বিপক্ষে ওরা যে খেলা খেলেছিল, এদিন সেই মান ধরে রাখতে পারেনি। পারলে, লড়াইটা নিঃসন্দেহে আরও জমত।



লতিফুদ্দিন গোল করলে হাবিব হাততালি দিচ্ছে, মাটিতে বসে বি এন আর গোলরক্ষক কুণাল মুখার্জি/ পাহাড়ী

মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম গোল পায় প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটে। হাবিবের কাছ থেকে বল পেয়ে দীনকর সেণ্টার পাঠায় বক্সে। নাজিব হেড করে হাবিবকে দেয়। হাবিব আবার হেড করেই বলটা ফিরিয়ে দেয় নাজিবকে। নাজিব ঠিকমত বলের দখল নিতে পারে না। বি এন আরের কোন একজন খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে বল আসে লতিফুদ্দিনের কাছে। লতিফুদ্দিন চলন্ত বলে সট করে বল জালে পাঠিয়ে দেয়। গোলরক্ষক কুণাল আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটু পরে ডাইভ দিলে হয়তো সে গোলটা বাঁচিয়ে দিতে পারত। এরপর বি এন আরের লেফট হাফ সজল দাসের চমকানো ফ্রি-কিকটি ক্রস পিসে লেগে উড়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের ছয় মিনিটে মহমেডানের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি হয় আত্মঘাতী। গোলের কিছুটা বাঁদিক থেকে অমলরাজ বলটা পুশ করে। কুণাল বলটা ধরতে এগিয়ে যায়। কিন্তু নরসিংহ মূর্তির পায়ে লেগে কুণালকে বিভ্রান্ত করে গড়িয়ে গড়িয়ে বলটা গোলে

ঢোকে। দু'গোল খেয়ে যাওয়ায় বি এন আরের হার অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়।

২৭ মিনিটে লেফট ব্যাক গৌরাঙ্গ ব্যানার্জির সেণ্টারটি ধরে হাবিব আস্তে করে পিছন দিকে লতিফুদ্দিনকে বাড়িয়ে দেয়। বলটা ধরেই লতিফুদ্দিন বক্সের একটু বাইরে থেকে তৎপর ও চকিত সটে গোল করে। নিঃসন্দেহে এই মরশুমে লতিফুদ্দিনই মহমেডান আক্রমণের মূল অস্ত্র।

বস্তুতপক্ষে দু'গোল খেয়েই বি এন আর এদিনের ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে। তেমন ভাবে আর কখনো ওরা খেলার মধ্যে ফিরে আসতে পারেনি।

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ নাসির আমেদ, ফিলিপ, মঈদুল ইসলাম, অশোক চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি সমরেশ চৌধুরী, অমলরাজ, লতিফুদ্দিন, হাবিব, নাজিব এবং দীনকর।

বি এন আর ঃ কুণাল মুখার্জি, তুষার ভট্টাচার্য, বিপ্লব মজুমদার, সুদীপ চ্যাটার্জি, অমিত দাশগুপ্ত, নরসিংহ মূর্তি (তপন বিশ্বাস), সজল দাস, কিশোর দাস (স্বপন চৌধুরী), বীরবাবু, প্রদীপ প্রশান্ত, সুভাষ বোস।

রেফারি ঃ এস এ হাকিম।



ইস্টবেঙ্গল কিভাবে ফাইনালে উঠেছে

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল—৪ ঃ টালিগঞ্জ অগ্রগামী—০

(শঙ্কর ব্যানার্জি (আত্মঘাতী)
সুরজিত ১, হরজিন্দার-১,
মনজিত ১)

সেমিফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল—৫ ঃ দক্ষিণ কোরিয়া—৪

(সুরজিত-১, চিন্ময়-১, হরজিন্দার-১ গুরুদেব-১, মনজিত-১) (কিম হং সুপ-২, হা তাই বং-১, লি কাই সুক-১।

[খেলার নিষ্পত্তি হয়েছে টাইব্রেকারে]

মোহনবাগান কিভাবে ফাইনালে উঠেছে

কোয়ার্টার ফাইনাল

মোহনবাগান—৩ ঃ কালিঘাট—০

(মানস-১, পায়াস-২)

সেমিফাইনাল

মোহনবাগান—৩ ঃ মহঃ স্পোর্টিং—১

শ্যাম-১, প্রদীপ চৌধুরী-১, পায়াস-১) (দীনকর-১,

আই এফ এ শিল্ড ফাইনালের বিস্তারিত খবর ও ছবি আগামী সংখ্যায়

শিল্ডে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারের ফল

সাল				
১৯৪৪	সেমিফাইনাল	ইস্টবেঙ্গল—১ (ভি রাও)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৪৫	ফাইনাল	ইস্টবেঙ্গল—১ (পাগসলে)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৪৭	"	মোহনবাগান—১ (সেলিম)	ঃ	ইস্টবেঙ্গল—০
১৯৪৯	"	ইস্টবেঙ্গল—২ (ভেঙ্কটেশ, আমেদ খান)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৫১	"	ইস্টবেঙ্গল—০	ঃ	মোহনবাগান—০
	রিপ্লে	ইস্টবেঙ্গল—২ (সালে-২)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৫৮	ফাইনাল	ইস্টবেঙ্গল—১ (কেম্পিয়া (আত্মঘাতী))	ঃ	মোহনবাগান—১ (সমর ব্যানার্জি)
	রিপ্লে	ইস্টবেঙ্গল—১ (নারায়ণ)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৬১	ফাইনাল	ইস্টবেঙ্গল—০	ঃ	মোহনবাগান—০
	রিপ্লে	ইস্টবেঙ্গল—০	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৬৪	ফাইনাল	ইস্টবেঙ্গল—১ (অসীম মৌলিক)	ঃ	মোহনবাগান—১ (জার্নেল সিং-পেনাল্টি)
১৯৬৫	"	ইস্টবেঙ্গল—০	ঃ	মোহনবাগান—০
	রিপ্লে	ইস্টবেঙ্গল—১ (অসীম মৌলিক)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৬৭	ফাইনাল	ইস্টবেঙ্গল—০	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৬৯	"	মোহনবাগান—৩ (প্রণব গাঙ্গুলি-২, সুকল্যাণ)	ঃ	ইস্টবেঙ্গল—১ (কান্নন)
১৯৭২	"	প্রথম দিনের খেলায় মোহনবাগান সুকল্যাণের দেওয়া গোলে এগিয়ে থাকার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। পরে মোহনবাগান খেলতে রাজী না হওয়ায় ইস্টবেঙ্গলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।		
১৯৭৩	সেমিফাইনাল			
১৯৭৪	ফাইনাল	ইস্টবেঙ্গল—১ (সুভাষ)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৭৫	"	ইস্টবেঙ্গল—৫ (সুরজিত, শ্যাম-২, রঞ্জিত ও শুভঙ্কর)	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৭৬	"	ইস্টবেঙ্গল—০	ঃ	মোহনবাগান—০
১৯৭৭	"	মোহনবাগান—১ (শ্যাম থাপা)	ঃ	ইস্টবেঙ্গল—০

বিঃ দ্রঃ—১৯৬১ ও ৬৭ সালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল যুগ্ম-বিজয়ী হয়। ৬৪ ও ৬৭ সালে অনিবার্য কারণে খেলা পুনরনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায় শিল্ড পরিত্যক্ত হয়।

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় রেখা ঃ জি সান্ত্রা ২১



এ অর্থহীন অভিযোগ কেন ?

৩১ আগস্ট, সঞ্জয় দের চিঠিটি পড়লাম। উনি লিখেছেন,...আমার মনে হয়, যে মেয়েরা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যায় তাদের অধিকাংশই ফুটবল খেলার কিছুই বোঝে না। শ্রীদে'র মনে এরকম ধারণা কেন হল কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। উনি কি যারা ফুটবল খেলা দেখতে যায় তাদের অধিকাংশকেই চেনেন এবং বেশ ভালো করে জানেন যে তারা ফুটবল খেলার 'কিছুই' বোঝে না ? এমন ধৃষ্ট মন্তব্য তিনি করেন কি করে কে জানে। আগে মেয়েদের জগৎ বর্তমানের মতো প্রসারিত ছিল না বলেই তারা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি বা তাদের আগ্রহ সর্বত্র প্রকাশ করতে পারেনি। এখন গণ্ডী প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেমন ফুটবল খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছে তেমনি খেলতে নেমেও। এবং বেশ সাফল্যের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। এমনকি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী—কিছু ক্ষেত্রে। শ্রীদের অনুরোধ '....সকালে মাঠে যাবেন না এবং সত্যিই যারা ফুটবল খেলাকে বোঝেন এবং ভালো-বাসেন তারাই মাঠে যাবেন।' তাকে জানাই, যারা সত্যিই ফুটবল খেলাকে বোঝেন, ভালোবাসেন বা দেখে আনন্দ পান তারা প্র্যাকটিসে ও মাঠে না গিয়ে পারে না। তার এ অনুরোধের কারণ নাকি—খেলোয়াড়দের ক্ষতি। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন উপস্থিত মেয়েদের কাছে উপহাসের পাত্র হওয়ার ভয়ে সাব্বির আলি নাকি তার দুর্বল বাঁ পায়ে সট করেন নি, কোচের নির্দেশ সত্ত্বেও। যে কারণে মেয়েরা উপহাস করতে পারে সে কারণে উপস্থিত ছেলে দর্শকরাও উপহাস করতে পারে। তাদেরটা গায়ে লাগবে না, মেয়েদেরটা লাগবে কেন ? যদি শুধুমাত্র 'এই' কারণেই সাব্বির আলি সট না করে থাকেন, তবে সেটা তারই নিজস্ব দুর্বলতা, নড়বড়ে মনের পরিচয়—তার জন্য প্র্যাকটিস দেখতে যাওয়া সব মেয়েরা খেলোয়াড়দের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে—শ্রীদের এ অর্থহীন অভিযোগ কেন ?

ভাস্বতী দাস,
রাণীবাগান, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

(২).

আজ আমার প্রিয় 'খেলার আসর' পত্রিকায় পাঠকের কলমে 'মেয়েরা মাঠে কেন' পড়ে বড়ই মর্মাহত হলাম। এখানে লেখক লিখেছেন, (১) আজকাল মাঠে যাওয়াটা মেয়েদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে. (২) মেয়েরা খেলা বোঝে না, মেয়েদের মূল লক্ষ্য প্লেয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কথাটা কি সব মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিছু মেয়ে হয়তো যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলতে পারি, সব ছেলেরা কি খেলা বোঝে, না গুণ্ডামি করতে যায়। আপনারা খেলা বোঝা বলতে কি বোঝান ? কোন প্লেয়ার ভালো খেললে তাকে নিয়ে নাচানাচি করা আর খারাপ খেললে তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করা। আমরা তো শুধুমাত্র দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। আর সেই জন্যই প্র্যাকটিস দেখতে যাই। এর থেকেও কি মেয়েদের আপনারা বঞ্চিত করতে চান। আর তা না হলে মেয়েদের পৃথক গ্যালারির ব্যবস্থা করুন। সবশেষে শুধু এইটুকুই বলতে চাই মেয়েদের উপস্থিতিতে প্লেয়াররা যদি খেলতে না পারেন বা বিব্রত বোধ করেন, তবে মেয়েরা নিশ্চয়ই যাবে না। কারণ মেয়েরা তাদের প্রিয় দলকে সত্যিকারের ভালোবাসে, জয়লাভটা কামনা করে সেইজন্যই মাঠে যায়, প্লেয়ারদের জন্য নয়।

কলকাতার কয়েকজন ছাত্রী।

(৩)

৩১ আগস্ট প্রকাশিত সঞ্জয় দে-র লেখ চিঠির প্রতিবাদস্বরূপ এই চিঠি।

তিনি লিখেছেন যে তিনি প্রদীপ ব্যানার্জি এবং আরো গণ্যমান্য কয়েকজন ফুটবল কোচ এবং প্লেয়ারদের সঙ্গে একমত হয়ে মেয়েদের সকালবেলা প্র্যাকটিস দেখতে যেতে বারণ করছেন। এবং এর কারণস্বরূপ এমন একটি যুক্তি খাড়া করেছেন যা অত্যন্ত দুর্বল। কারণ প্রথমেই বলা যায়, কলকাতা ফুটবল মাঠের কোন বড় দলের ফাইনাল খেলার দিন যা অবস্থা হয় তাতে মেয়েদের বসে খেলা দেখা একরকম অসম্ভব। এবং এইরকম অবস্থার সৃষ্টি করেন তথাকথিত ফুটবল-প্রেমিক হিসেবে পরিচিত কিছু অদর্শক। যাদের কাজ গ্যালারিতে বসে বসে যখন যার উপর রুষ্ট হন তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা। প্রিয়দল জিতলে অযৌক্তিক উল্লাসে মেতে ওঠা—আশপাশ ভুলে গিয়ে। তাদের এই আনন্দ প্রকাশের জন্য অন্য কারুর অসুবিধা হতে পারে। এর মধ্যে একটি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে জলন্ত চকোলেট বোম ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফাটানো। এই অসহনীয় অবস্থায় কি করে মেয়েরা মাঠে যেতে পারে ? আপনারা বলতে পারেন অনেকে যায় ? এবং এই অনেকেদের অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো জানা গেছে তাও বলে রাখছি।

শ্রীদে সকালবেলা মাঠে যাওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছেন, সাব্বির আলির বাঁ পায়ে সট না করার উদাহরণটি দিয়েছেন। কারণ মেয়েদের উপস্থিতি। কিন্তু আমার প্রশ্ন খেলোয়াড়রাই বা এত দুর্বল হবেন কেন ? তাদেরই বা মনের জোর এত কম হবে কেন ? তারা দলের জন্য খেলছেন, দেশের জন্য খেলছেন, সমর্থকদের জন্য খেলছেন এবং এই মহিলারাও নিশ্চয়ই সমর্থক, এরাও নিশ্চয়ই ফুটবল ভালবাসেন এবং মাঠে যেতে পারেন না বলে প্রিয়দলের খেলা দেখতে না পাওয়ার দুঃখটুকু তাদের প্রিয়দলের প্র্যাকটিস দেখে মিটিয়ে নেন। তাই বলে তারা যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যান বা মনযোগ হরণ করতে যান তা আমি কেন, আরো অনেকেই মানবেন না। আর ক্রিকেটারদের কথা বলছেন, যারা এরকম করেন তাদের কথা জানি না, তবে আমিও খেলা দেখতে ইডেনে অনেকবার উপস্থিত থেকেছি ! কই আমার চোখেতো ওরকম কাউকে পড়েনি। তবে নেই এরকম বলব না। কিন্তু যারাই প্র্যাকটিস দেখতে যান তারাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যান বা খেলার কিছু বোঝেন না একথা যদি স্বয়ং অরুণ ঘোষ, পি কে ব্যানার্জি বা প্লেয়াররাও বলেন তা মানতে পারব না। কারণ তারা ১০ জনের মধ্যে ২ জনের আচরণ দিয়ে প্র্যাকটিস দেখতে উপস্থিত ৫০ জনকেই বিচার করতে পারেন না।

সুস্মিতা ব্যানার্জি, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

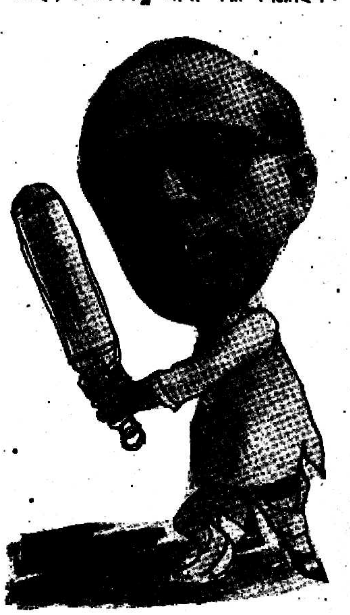
২০ আগস্ট সংবাদপত্রে আপনাকে ক্রিকেট ব্যাট হাতে কলকাতায় আচ্ছাদিত ক্রিকেট পিচের উদ্বোধনের ছবি দেখলাম। সুন্দর ছবি, খুব আশ্চর্য হলাম। দেখলাম আজন্ম সাম্যবাদের একনিষ্ঠ বক্তা, কেবলমাত্র ঝুটা জনপ্রিয়তার লোভে ক্রিকেটের মত একটা বুর্জোয়া খেলাকে কেমন সমর্থন ও উৎসাহিত করছেন। 'ক্রিকেট খেলা রাজার খেলা' 'খেলার রাজা ক্রিকেট' এটা ধাপ্পা। সত্যিই যদি খেলার রাজা ক্রিকেট হত তবে সারা পৃথিবী ক্রিকেটকে গ্রহণ করত। কিন্তু সারা বিশ্ব ক্রিকেটকে গ্রহণই করেনি। মহাশয়, আপনি নিশ্চয় জানেন পৃথিবীতে মাত্র আটটি দেশ ক্রিকেট খেলে ; প্রভু ইংরেজ, তার তিন উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা। আর বাকি চারটি দেশ ভারত, পাকিস্তান, সিংহল এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দু'শ বছর ধরে যারা ইংরেজের পদানত ছিল।

আপনি কি বলতে পারেন বিশ্বের কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ এ খেলাকে গ্রহণ করেছে। ক্রিকেট খেলা সার্বজনীন খেলা নয়, ক্রিকেট খেলা আন্তর্জাতিক খেলা নয়, ক্রিকেট অতীব ব্যয়বহুল খেলা, আর আপনি বামপন্থী সরকারের কম্যুনিস্ট পার্টি'র মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওই ক্রিকেটকে সমর্থন করছেন।

গত ৩২ বছরে ভারতে ক্রিকেটের জন্য সমষ্টিগতভাবে যে অর্থের অপচয় হয়েছে,

পাঠকের কলমে

সেই অর্থে ভারতের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে জিমন্যাসিয়াম অথবা সাধারণ পুল অথবা একটি সারা বছরে ব্যবহার উপযোগী ভলিবল কোর্ট করা যেত। কিন্তু তা হয়নি, শুধু সরকারের অকর্মণ্যতা আর নির্বুদ্ধিতার জন্য। তাই পশ্চিমবঙ্গে যখন বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা হল, যার প্রধান শরিক হল সি পি এম, বিশ্বের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার যেভাবে খেলাধূলাকে বেঁচে থাকার অঙ্গ হিসেবে মেনে নিয়ে ঐকান্তিক আগ্রহে পরিকল্পনা মাফিক কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে ; তেমন কিছু আশা করা গিয়েছিল।



তার ধার দিয়েও যাচ্ছেন না। বরং আগেকার কংগ্রেসী সরকারের পথ ধরেই চলেছেন।

বলুন তো আপনার সরকার গত দু'বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের হাতে কটি সাঁতারের পুল তুলে দিয়েছেন ? অথবা দেবার মত অবস্থায় এসেছেন। একটিও না, অথচ এই দু'বছরে অন্তত দুশোটি পুল বাংলার ভাই-বোনেদের হাতে দেওয়া যেত। যদি...

যদি দেখতাম আপনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শহরে অথবা গ্রামে একটি অতি সাধারণ আচ্ছাদিত ভলিবল কোর্ট সরকারের তরফ থেকে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলেন যেখানে সারা বছর ধরে ছেলে-মেয়েরা অনুশীলন করতে পারে। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলতাম বামপন্থী সরকার জিন্দাবাদ।

তবু তো কংগ্রেসী সরকারের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কলকাতার বুকে একখানা মনমাতানো স্টেডিয়াম করে গেছেন।

আমরা রাজনীতি বুঝি না, আমরা রাজনীতিকে ঘৃণা করি। আমরা বুঝি সরকার আমাদের ছোট ছোট ভাই-বোনেদের জন্য কি করেছে, আর কি করবে।

সংঘমিত্রা দাস,
চাতরা, শ্রীরামপুর।

শুধু বাংলার নয়

১০ আগস্ট খেলার আসরে 'বাঙালী বাংলা শুধুই তোমাদের নয়' পড়ে খুব ভাল লাগল। সেজন্য অভিনন্দন জানাই রাজুকে আর আমার প্রিয় পত্রিকা খেলার আসরকে। আমরা বিহারে প্রবাসী হলেও কলকাতার ফুটবল লিগ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী।

সবশেষে বাংলার যুবসম্প্রদায় ও খেলোয়াড়দের কাছে অনুরোধ, তারা যেন খেলাটাকে স্পোর্টিংলি নেন। খেলা নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি না হয়।

টুম্পা।

কলকাতা ফুটবল কি শুধু...

কলকাতা ফুটবল কি শুধু কলকাতাবাসীদের, না সারা পঃ বঃ বাসীদের এ প্রশ্নটা বারবার আমার মধ্যে আঘাত করছে—এর সত্যতা কতদূর জানি না। ১৩ আগস্ট মোহনবাগান এরিয়ান্সের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম সুদুর ১১০ কিমি দূর গ্রাম থেকে। মাঠে দেখি লোকে লোকারণ্য, পুলিশের দাপাদাপি, স্থানীয় ছেলেদের উৎপাত, একটা দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। ৬নং গেটে লাইন দিলাম। গ্রাম্য ছেলে ওই রকম লোকজন, বড় বড় ঘোড়ার উপর পুলিশকে দেখেই প্রাণ যায় যায়। সোয়া দুটোয় কাউন্টার খুললে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। কিছু ছেলে জোর করে লাইনে ঢুকতে চেষ্টা করলে গণ্ডগোল বাধল। অবস্থা সামলাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলো, ঘোড়া নিয়ে লাইন ভেঙে এপার ওপার করতে লাগল। হঠাৎ একটা পুলিশের লাঠি আমার ঘাড়ে পড়ল, পাশে ড্রেন ছিল, তার মধ্যে পড়ে গেলাম এবং এখন একটা ভাঙা হাত নিয়ে হাসপাতালে রয়েছি। নিরীহ মানুষের উপর এ রকম অত্যাচার সত্যই বিরল। সভ্য সমাজে এটা একটা কলঙ্কের। সভ্যতার পীঠস্থান কলকাতায় আমাদের ঠাঁই নেই। কত নিরীহ মানুষের উপর এরকম অত্যাচার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই আজ বারবার মনে হয়েছে—না জানি কলকাতায় গিয়ে

কি ভুলই করেছিলাম—জানা উচিৎ ছিল কলকাতা শুধু কলকাতা বাসীদের, ওখানে আমাদের ঠাঁই নেই।

দীন মহম্মদ সেখ, নদীয়া।

হ্যাটট্রিক প্রসঙ্গে

২৪ আগস্ট সংখ্যায় একটি তথ্যগত ভুলের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ওই সংখ্যার ৪৪ পৃষ্ঠায় ইস্টবেঙ্গল বনাম জর্জ টেলিগ্রাফের খেলার বিবরণে বলা হয়েছে যে সাব্বির আলির আগে কলকাতার ফুটবল লিগ ইতিহাসে কোন খেলোয়াড় এক মরশুমে তিনটি হ্যাটট্রিক করতে পারেনি। খবরটি ঠিক নয়।

আপনাদের অগণিত পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাই যে ১৯৬৬ সালে বি এন আর দলের রাজেন্দ্রমোহন কলকাতা লিগে চারটি হ্যাটট্রিক করেন যথাক্রমে এরিয়ান (১ম দফা) জর্জ টেলিগ্রাফ (১ম দফা), বালী প্রতিভা (২য় দফা) এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২য় দফা) দলের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের বিরুদ্ধে তিনি হ্যাটট্রিক সহ ছটি (৬) গোল করেন।

সৌম্যেন মল্লিক, কলকাতা-২৫।

দোষ কি রেফারি ও লাইন্সম্যানের

২৪ আগস্ট সংখ্যায় আশিস ঘোষের চিঠি পড়ে মর্মাহত হলাম। কারণ উনি লিখেছেন যে ৪ আগস্ট মহমেডান ইস্টবেঙ্গল-এর খেলায় মহমেডানের গোল লাইনের ভেতর থেকে মহমেডানের কোন একজন খেলোয়াড় সাব্বিরের ঠেলে দেওয়া বল হাত দিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছেন। এবং রেফারি তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইস্টবেঙ্গলেরই বিপক্ষে ফ্রি-কিক্ দিয়েছেন। কিন্তু মাঠে সেই সময় আর ও প্রায় বাকি যে ২৬ হাজার দর্শক ছিলেন তারা কি সেই মুহূর্তে চোখ বন্ধ করেছিলেন যে এই দৃশ্য সকলকেই এড়িয়ে গেল। তাছাড়া আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন পত্র-পত্রিকাতেই কিছু লেখা হয়নি। যদি এধরনের ঘটনা ঘটতই তাহলে 'খেলার আসরের' মত নিরপেক্ষ পত্রিকা এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকত না। এবং কলকাতা মাঠে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীও এত বড় অন্যায়কে সহ্য করতেন না। তাই শুধু রেফারি ও লাইন্সম্যানদের দোষারোপ করে লাভ কি?

উত্তম ঘোষ, বাঘাযতীন রোড, শিলিগুড়ি।

মোহনবাগানের ফল

২৪ আগস্ট সংখ্যায় 'লিগে মোহনবাগানের ফল' লেখাটিতে দুটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। আপনারা লিখেছেন যে মোহনবাগান ৫-০ গোলে কুমারটুলিকে হারায়। কিন্তু মোহনবাগান কুমারটুলিকে হারায় ৪-০ গোলে. এবং আরও লিখেছেন যে মানস দুই গোল দেয়। কিন্তু মানস সেদিন এক গোল দেয়। বাকী তিনটি গোল দেয় গৌতম, পায়াস ও তপন।

সৌমেন ঘোষ ও উজ্জ্বল ঘোষ
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

স্বরাজ ঘোষের রচনা আমাদের সম্পদ

২৪ আগস্ট প্রকাশিত 'পাঠকের কলমে' স্বপন চট্টোপাধ্যায় লিখিত স্বরাজ ঘোষের লেখা পড়ে বড়ই দুঃখ পেলাম। স্বরাজ ঘোষকে আমরা বহুদিন থেকে জানি। তার খেলোয়াড়ী জীবনে তিনি যেমন ছিলেন আদর্শ খেলোয়াড় তেমনি এশিয়ার শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী চরিত্রবান ফুটবল কোচ। তিনি যে ধরনের লেখা লিখছেন তার তুলনা হয় না। শিশুদের পক্ষে, এমনকি ফুটবল খেলোয়াড়দের পক্ষে এ এক সম্পদ বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের ফুটবল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তাকে দিয়ে যে লেখা লেখাবার ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। স্বপনের লেখা পড়ে মনে হয় না সে অজ্ঞ খেলোয়াড় বা তার খেলা শেখবার আগ্রহ আছে। আমার অনুরোধ স্বরাজবাবু যেন এঁদের কথায় কান না দেন ও লেখা বন্ধ করে দিয়ে নবীন খেলোয়াড়দের আশাহত না করেন।

নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি, ইচ্ছাপুর,
২৪ পরগণা।

(২)

২৪ আগস্ট প্রকাশিত স্বরাজ ঘোষের লেখা সম্বন্ধে স্বপন চট্টোপাধ্যায়ের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পড়ে বড়ই মর্মাহত হলাম। তিনি লিখেছেন, 'খেলার উন্নতি না করতে পারেন, অবনতি করবেন না।' আবার তিনি নিজেকে এক অজ্ঞ গোলকিপার বলে লিখেছেন। ঠিকানা দিয়েছেন, বাজে প্রতাপপুর, বর্ধমান। আবার লিখেছেন, 'Something is better than nothing', কিন্তু এসব লিখে নিজেই নিজেকে ধরা দিয়েছেন যে, তিনি মোটেই অজ্ঞ নন এবং আসল ঠিকানা এটা নয়। মনে হয় গড়ের মাঠের রক্তমাংসহীন এক গোলকিপার। আর সম্পূর্ণ লেখাটা পড়েননি। যাইহোক, তাই তিনি চটেছেন এই বলে যে স্বার্থে ঘা পড়েছে। এদের জন্যই তো ভারত বিদেশে আট-দশ গোল খায়, এদের অপদার্থতার জন্যেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ অরুণ ঘোষ বলি হলেন। স্বরাজ ঘোষের মত এরকম মূল্যবান লেখা আজ অবধি কে লিখেছে?

সলিল বসু, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

আমি তাহলে কাদের সমর্থক

আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক। খেলাকে ভালোবাসি বলেই একটা প্রশ্ন আমি বাংলার খেলাপ্রিয় নাগরিকদের কাছে রাখতে চাই।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল। তার সঙ্গে রয়েছে দু'দলের কট্টর সমর্থক। বাংলাদেশেও তেমনি এই দু'দলের কিছু না কিছু সমর্থক রয়েছে, বিশেষ করে খেলাকে যারা ভালবাসে। পশ্চিমবাংলায় একটা প্রবাদ আছে, যে মোহনবাগানের সাপোর্ট করে সে হলো ঘটি আর ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক বাঙ্গাল। তাহলে আমি মোহনবাগানকে সাপোর্ট করি বলে কি ঘটি হয়ে যাবো? এটা নিশ্চয় ফুটবল অনুরাগীদের কথা নয়।

অসীম কুমার দত্ত,
টেরিবাজার বাই লেন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মহমেডান স্পোর্টিং-এর প্রতি অবজ্ঞা

মহমেডান স্পোর্টিংকে ভারতীয় ফুটবলে নবযুগের দিশারী বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু আজ বোধহয় তারা পথের ভিখারী বললেও মনে হয় অবিচার হবে না। কেন আজ একথা বললাম। এক নাগাড়ে মহমেডান দলের বিরুদ্ধে চলছে চক্রান্ত। হাত বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ, পরিচালক, দর্শক, সাংবাদিক, ক্রীড়ামোদী ও বেতার ভাষ্যকাররা। কিন্তু এটা না করলেই কি নয়?

খেলার তালিকা প্রণয়নে দেখা গেল মহমেডান দল দু'সপ্তাহে দুটি ম্যাচ খেলছে। অন্যদল খেলছে তিন বা চারটি ম্যাচ। আজকালকার রেফারিদের প্রতি নির্দেশ থাকে কোন দলের বিরুদ্ধে খেলাতে হবে এবং কার দিকে টেনে চলতে হবে। ধারাভাষ্যকারেরাও একই পথ বেছে নিয়েছেন। মহমেডান দল আক্রমণ চালালে তারা গল্প করতে থাকেন, যেটা অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু প্রতিপক্ষ দল বল পেলে গলা বাড়িয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে খেলার বিবরণী দিতে থাকেন। ঘটনার উজ্জ্বল ও দৃষ্টিকটু নজীরটি ফুটে উঠেছে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে লিগের খেলায়। বিরতির সময় ভাষ্যকার ইস্টবেঙ্গলের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সমাপ্তির পরও তাই করলেন, কিন্তু মহমেডানের এতটুকুও প্রশংসা করলেন না। বাংলা ধারাভাষ্যকাররাই এই ঘটনার অবতারণা বেশী করে থাকেন।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা খেলোয়াড় এবং রেফারিকে লাথি মারলেও তারা সতর্কিত হননি, হননি অনেক সময় আই এফ এ-র দৃষ্টি গোচরীভূত। অথচ মহমেডান বা অন্যান্য দলের খেলোয়াড়রা রেফারিকে আবেদন করলেই হয়ে যায় গুরুতর অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এই অবিচার কেন?

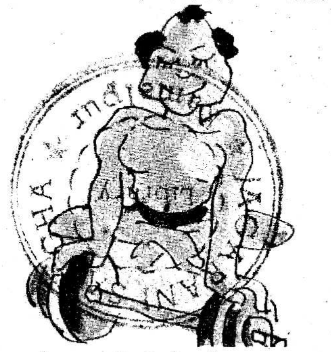
কিছুদিন আগে প্রদীপ ব্যানার্জি মন্তব্য করলেন, হয়ত ইস্টবেঙ্গল মহমেডানকে আরো বেশী গোলে হারাবে'। তিনি আজ ফুটবল বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত। তার মুখ থেকে এরূপ মন্তব্য আশা করা যায় কি? অনেককেই বলতে শুনছি 'খেলার আসর' পি কে-কে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে। এটা অযৌক্তিক নয়। আরো অভিযোগ করেছেন, খেলার বিবরণী দেওয়ার প্রয়োজন কি? যেটা পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়! কিন্তু একটি সর্বভারতীয় পত্রিকার জন্য এটা অপ্রয়োজনীয় নয়। কেননা অনেক জায়গায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি গিয়ে পৌঁছায়নি বলেই আমার মনে হয়।

এসব দেখে কি বলতে ইচ্ছা করে না কি, মহমেডান দল এতই অযোগ্য? তারা কি কারও সুনজরে পড়তে পারে না। এমন কি খেলোয়াড়েরাও তাদের দেখতে পারে না। মোহনবাগান-মহমেডানের খেলার বিবরণীতে জনৈক ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় লিখলেন, মোহনবাগানের কয়েকজন ফরোয়ার্ড স্বকীয় ভঙ্গিতে ফুটে উঠেনি, কিন্তু বলতে পারলেন না মহমেডানের ডিফেন্স তাদের কার্যকরী হতে দেয়নি। আবার সেই খেলোয়াড় যখন মহমেডানের পাহাড় প্রমাণ দুর্গে আঘাত হানতে গিয়ে ঘা খেয়ে ফিরে এল তখন তিনি মন্তব্য করতে পিছ-পা। ভাল খেললে মহমেডান খেলোয়াড়দের উপরই হয় দর্শকদের হামলা।

এম এইচ রাজা, ২৬ রথু সরকার লেন,
কলকাতা।

কমল ভাণ্ডারী কি যোগ বিশেষজ্ঞ?

হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ দেখে যদি শুধুমাত্র হাসিতেই ক্ষান্ত হওয়া যেত তাহলে খেলার আসরে পাঠকের কলম বিভাগে এটা লেখার দরকার হত না। হ্যাঁ ঘটনাটা এই যে, জনপ্রিয় খেলার আসরে দেখলাম সুপরিচিত বডি বিল্ডার কমল ভাণ্ডারী যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা তো তাকে সুপরিচিত বডি বিল্ডার হিসাবেই জানি। তিনি আবার যোগাসন বিশেষজ্ঞ কবে হলেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে এখানেও সেই খুঁটির জোর নামক অপদেবতার হাতছানি ছিল। কলকাতা



দূরদর্শনেরও সেই একই মতিভ্রম হয়েছে, না হলে তাকে যোগ শিক্ষক নির্বাচিত করা কেন? এককালে বাংলার বডি বিল্ডিং-এর স্থান কোথায় ছিল, আর আজ সেই অবনমন কোথায় এসে ঠেকেছে কেউ ভেবে দেখেছেন কি? কমল ভাণ্ডারী বডি বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে আগামী দিনের যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করাই কি আপনার ক্ষেত্রে অধিক গৌরবের ছিলনা? আপনি কি বলেন?

কুমার শ্যামল, কলকাতা-৫৪

নাই বা দিলেন

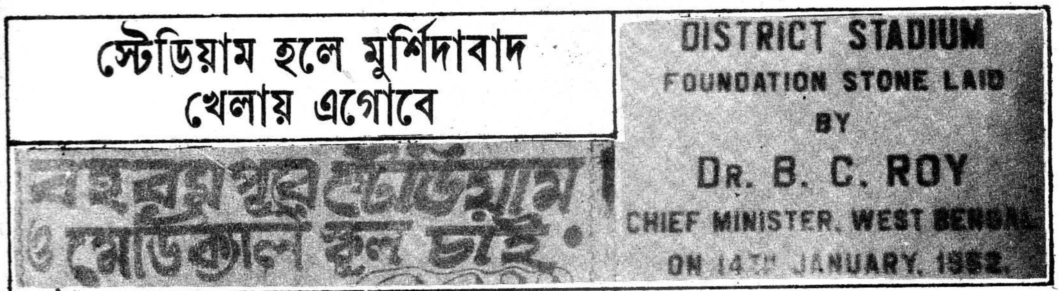
আপ্পারাও, ভেঙ্কটেশ, সালে, তারপর সুরেন ঠাকুর সবাই চলে গেলেন, আর বাকি কারা? এরা সবাই ভারতবর্ষকে সব কিছু দিয়েছেন, রেখেছেন দেশের মান। দেশের জন্য প্রাণপণ লড়েছেন, কিন্তু দেশের কাছ থেকে পেয়েছেন কিছু? অতীতের বীর যারা, তারা কি এখন কেউ নন? তারাই তো ভারতের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন 'ফুটবল'-কে নিয়ে।

তবে কেন তাদের শেষ জীবনটাতে এত কষ্ট? আপনারা যারা 'অতীতের ফুটবলারদের' জীবনী লেখেন তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন ওই ব্যক্তির শেষ জীবন নিয়ে কিছু না লেখেন, অর্থাৎ শেষ জীবনে কিভাবে কাটাচ্ছেন সে কথা না জানাই ভালো, কারণ এখন তাদের শেষ জীবন। তাদের দিকে তাকাবার লোক নেই। নেই তাদের প্রিয় ক্লাবগুলি, অর্থাৎ (যে ক্লাবে তারা খেলতেন) আর রাজ্য সরকার এসব ব্যাপারে তো আগে থেকেই অন্ধ। কাজেই এসব কথা উল্লেখ করা মানে ছোট ছোট ছেলেদের মনে দুঃখ দেওয়া।

কমল কুমার নস্কর, বাটানগর।

এবারে সেরা চিঠির জন্য পুরস্কার পাবে চট্টগ্রামের (বাংলাদেশ) অসীম কুমার দত্ত।

স্টেডিয়াম হলে মুর্শিদাবাদ খেলায় এগোবে



বহরমপুর থেকে সুব্রত চট্টরাজ : ১৯৪১ সালে ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জি, মহম্মদ আজাহার হোসেন, প্রণব সেন প্রমুখ মুর্শিদাবাদের খেলাধূলার উন্নতিকল্পে স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদ ক্রীড়া সংস্থা। এই সংস্থার অনুমোদন পেয়ে তখন হুইলার শিল্ড, নওলাক্ষ্যা শিল্ড, নারায়ণ শিল্ড, শিবপ্রসাদ কাপ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদকে খেলাধূলার ক্ষেত্রে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দুই বাংলা এবং বাংলার বাইরের বহু নামী খেলোয়াড় নিয়ে তৈরি বহু নামী দল ওইসব প্রতিযোগিতা খেলতে আসত এবং মুর্শিদাবাদের খেলা-পাগল জনগণের ক্রীড়া ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করত।

মুর্শিদাবাদ ক্রীড়া সংস্থা শুরু হয় ১০টি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান নিয়ে আর বর্তমানে ৩৮ বছর পর (১৯৪১—১৯৭৯) ৬০টি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে সংস্থার—কিন্তু একে একে দেউটির ন্যায় তৎকালীন প্রায় সব প্রতিযোগিতাই নিভেছে, রয়েছে কেবলমাত্র হুইলার শিল্ড প্রতিযোগিতা, তাও মৃত প্রায় অবস্থায়।

সবদিক থেকেই আজ মুর্শিদাবাদ ক্রীড়া সংস্থা ব্যর্থ। ক্রিকেটে মাত্র একবার আন্তঃ জেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে জেলা ক্রিকেট দল। তিনবার রানার্স। ফুটবলে একবার মাত্র বহু আগে রানার্স হওয়া ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। হকিতেও একই অবস্থা। কেবলমাত্র অ্যাথলেটিক্স-এ এবছর (১৯৭৯) কিছুটা সুনাম হয়েছে। জেলার তিনজন প্রতিযোগী এবছর রাজ্য অ্যাথলেটিক্স দলে সুযোগ পেয়েছেন।

কিন্তু কেন এমন হোল? পিছিয়ে থাকা অন্য জেলাগুলি যখন ভাল ফল দেখাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়, তখন এক সময়ের এগিয়ে থাকা মুর্শিদাবাদ আজ কেন পিছিয়ে। জানতে চেয়েছি জেলার বিভিন্ন মানুষের কাছে, প্রতিষ্ঠানের কাছে, যারা জেলার খেলাধূলার সঙ্গে জড়িত।

এরা সকলেই নানা বিষয়ে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করেছেন। তবে প্রায় সকলেই একমত যে স্কুল কলেজ খেলাধূলার চর্চা কমে গিয়েছে। সকলেই দাবী জানিয়েছেন—জেলায় প্রস্তাবিত স্টেডিয়ামটি তাড়াতাড়ি তৈরি করার জন্যে।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদিত সংস্থাগুলির মতে স্কুল কলেজে খেলাধূলার চর্চা কমে যাওয়া, শহরের ছেলেদের মাঠে নামার অনিচ্ছা, ক্রীড়া সংস্থার পরিচালন ত্রুটি প্রভৃতিই জেলার খেলাধূলার মান নেমে যাওয়ার জন্য দায়ী।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংবিধানের অনেকগুলি ধারার মধ্যে একটি ধারায় বলা আছে, কোনরকম খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ না করেও কোন প্রতিষ্ঠান জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদন পেয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের অধিকার পাবে।' বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ ওই ধারাটির সাহায্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা বছরের পর বছর ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে বসে আছেন এবং সংস্থাটিকে একটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন। কর্মকর্তাদের ওই ভৌতিক প্রতিষ্ঠানের ভোটে ক্ষমতা হারাবার ভয় না থাকায় তারা ক্রীড়া সংস্থাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দুর্গ করে তুলেছেন। সংবিধানের ওই ধারাটি সংশোধনের জন্য ১৯৭৩ সাল থেকে জেলার ক্রীড়া অনুরাগীরা চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন এবং এবছর মার্চ মাসে অধ্যাপক রেণুপদ দাসের সহযোগিতায় ও চাপের কাছে নতিস্বীকার করে জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান কর্ম কর্তারা সংস্থার সংবিধানের ওই ধারাটির সংশোধন করেন। সংশোধিত ধারায় বলা হয়েছে, 'কোন প্রতিষ্ঠান জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ৭৫ ভাগ খেলায় অংশগ্রহণ না করলে সেই প্রতিষ্ঠান বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের অধিকার পাবে না।' নতুন সংশোধিত ধারাটি ১৯৮০ থেকে কার্যকরী হবে। বিভিন্ন মহলের ধারণা—এবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুর্নীতি কমবে। পুরানো কর্মকর্তাদের সরিয়ে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন করার সুবিধা হবে।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক ইন্দ্রনাথ মুখার্জি, বর্তমান সম্পাদক শুভ্রাংশু সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত ভট্টাচার্যের মতে আর্থিক দুরবস্থাই খেলার মান নেমে যাওয়ার কারণ। তারা জানালেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থা সরকারী অনুদান তেমন কিছু পায় না। আই এফ এ ও সি এ বি ৩৫০০ এবং খেলোয়াড়দের দল বদলের ফি, দল অনুমোদন ফি বাবদ যে টাকা পাওয়া যায় তাই দিয়েই বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জেলা দলকে তিনটি বিভাগে (সাবজুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র) দল পাঠাতে হয়। বর্তমানে প্রতিটি খেলার সরঞ্জামের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ওইসব প্রতিযোগিতায় দল পাঠাতে বিরাট খরচ করতে হয়। জেলায় একটাও ঘেরা মাঠ না থাকায় আর্থিক সংস্থান বাড়াবার জন্য মাঠ যে বছর টিন দিয়ে ঘেরা হয় সেবারই কিছুটা অর্থের মুখ দেখা যায়। তবে প্রতি বছর টিমের অভাবে মাঠ ঘেরা যায় না। সকলেই দাবি জানালেন, স্টেডিয়াম চাই। তারা বললেন, স্টেডিয়াম থাকলে বড় দলের খেলার ব্যবস্থা, আই এফ এ শিল্ডের খেলার ব্যবস্থা করে টাকার অভাব মিটবে। স্টেডিয়াম হলে সংস্থার নিজস্ব ঘর হবে। ঘর বাবদ কোন ভাড়া (যেটা এখন লাগে) লাগবে না। নিজস্ব ঘেরা মাঠ থাকলে তারা জানালেন, আরও ভাল কোচিং ব্যবস্থা করতে পারবেন। বর্তমানে কোচিং-এর ব্যবস্থা করতে গেলে মাঠের জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হয়। জেলায় ট্রেনিং প্রাপ্ত কোচের সংখ্যা কমের ব্যাপারে তারা জানালেন, গত দু'বছর জেলা থেকে দুজন প্রাক্তন খেলোয়াড় আই এফ এ কোচিং ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করছেন। তাদেরই একজন সন্তোষ সেনগুপ্ত তার কোচিং-এ এবছর সাবজুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় জেলা দল ভাল ফল দেখিয়েছেন। ওর কোচিং-এ সিনিয়র দল আই এফ এ শিল্ডে অংশগ্রহণ করে এবং ভাল লড়াই করে বোকারো স্টিল দলের বিপক্ষে।

স্টেডিয়াম তৈরির জন্য যে কমিটি তৈরি হয়েছে, তাতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোন প্রতিনিধি নেই এবং মুখ্যমন্ত্রীর দুজন প্রতিনিধি এখনও কার্যভার গ্রহণ না করায় স্টেডিয়াম তৈরি হতেও পারছে না।

পাতিয়ালায় ট্রেনিং-প্রাপ্ত কোচ দুর্গাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে শহরের ছেলেরা যখন মাঠে নামতে চাইছে না বা আগ্রহী নয় তখন জেলা ক্রীড়া সংস্থার উচিত গ্রাম থেকে ছেলে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। এব্যাপারে তিনি বিভিন্ন ব্লক-এ খেলাধূলার প্রতিযোগিতা শুরু করার বিষয়ে জোর দিলেন।

জেলার নামী খেলোয়াড়রা বললেন, স্টেডিয়াম হলে সেখানে বড় খেলা হতে পারবে। বড় দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পেয়ে সকলের নজরে পড়ার সুযোগ হয়।

কলকাতায় আগামী বছর গ্রাঁ প্রি টেবল টেনিস

স্টাফ রিপোর্টার : টেবল টেনিস ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া স্থির করেছে, আগামী বছর গ্রাঁ প্রি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লিতে জেনারেল কাউন্সিল মিটিং-এ বিদায়ী সভাপতি টি ডি রঙ্গরামানুজন জানিয়েছেন কলকাতার আসরে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১৬ জন খেলোয়াড় ও ভারতের আটজন বাছাই খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা আছে।

ওই সভাতেই ঘোষণা করা হয়, পঞ্চম এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ কলকাতা অথবা বাঙ্গালোরে হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে। এ মাসের শেষে স্থান নির্বাচনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কাউন্সিল মিটিং-এ অপর এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দুর্গাপুরে ডিসেম্বর মাসে টেবল টেনিসের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হওয়ার পরই ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে এক উপমহাদেশীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

টেবল টেনিস ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতির পুরস্কার পর পর তিন বছর পেল মধ্যপ্রদেশ। এই পুরস্কার দেওয়া হয়, যে রাজ্য এ খেলার উন্নতিকল্পে সবচেয়ে বেশী কাজ করতে পেরেছে, এই বিচারে।

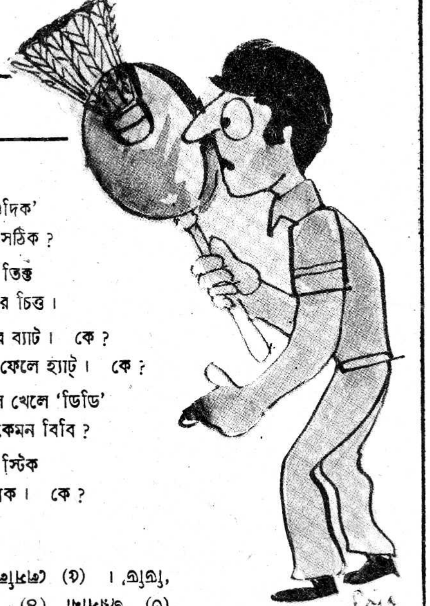
গত তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে টি ডি রঙ্গরামানুজন ভারতীয় টেবল টেনিস সংস্থার কর্ণধার ছিলেন। এবারের কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচনে রঙ্গরামানুজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তার জায়গায় সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন কান্তি চৌধুরী।

এই সংস্থার সম্পাদক ফণী শর্মা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সভার শেষে তিনি জানান, ভারতীয় টেবল টেনিসের অগ্রগতির ক্ষেত্রে রঙ্গরামানুজনের বিরাট ভূমিকার কথা এবং তাকে এই সংস্থার অবৈতনিক আজীবন সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি তার ইচ্ছামত ফেডারেশনের যে কোন সভায় যোগ দিতে পারবেন ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

কার্যনির্বাহক সমিতিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবেন গোপীনাথ ঘোষ।

বলো দেখি

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



১। পালকের বল ছোটে 'এদিক-ওদিক'
বলো দেখি কটি থাকে পালক সঠিক?

২। ঘুঁষোঘুঁষি মারামারি শুধু নহে তিক্ত
'চিনি' নামে ঘুঁষিবীর জয় করে চিত্ত।

৩। পাঁচদিন টেস্ট ম্যাচে রোজ করে ব্যাট। কে?
তাই দেখে 'রিচি বেনো' খুলে ফেলে হ্যাট্। কে?

৪। 'মাচি-পিচি' বালো লাঁধে, বল খেলে 'ডিডি'
ডাকু সোনা ভেবে আকুল, এ কেমন বিবি?

৫। ভারতের বীর ছেলে ধরে হকি স্টিক
পরপর চারবার খেলে ওলিম্পিক। কে?

উত্তর : (১) ১৪-১৬টি (২) সুগার রে-রবিন্‌সন, (৩) জয়সীমা (৪) ব্রাজিলের বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড 'ডিডি'। (৫) লেসলি ক্লডিয়াস ১৯৪৮, '৫২, '৫৬. '৬০

আন্তঃজেলা জুনিয়র ফুটবলে অঘটন ঘটাল নদীয়া

পুরুলিয়া থেকে অমল ত্রিবেদী : সকলেই যখন ২৪ পরগণা জেলার জয় সম্পর্কে একমত, ঠিক তখনই অঘটন ঘটে গেল আন্তঃজেলা জুনিয়র ফুটবলের ফাইনালে। এই প্রতিযোগিতার অষ্টম বর্ষের আসরটি বসেছিল পুরুলিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে জেলা স্টেডিয়ামে। ২৬ আগস্ট দশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে নদীয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ২৪ পরগণা জেলা দলকে নাজেহাল করে শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে জয়লাভ করে এই প্রথমবার কুমারেশ চন্দ্র স্মৃতি ট্রফি ঘরে তুলল। গত দু'বছরের বিজয়ী ২৪ পরগণা পেয়েছে রানার্সের সম্মান জিতেন্দ্রনাথ হাজরা ট্রফি।

বিকেল তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে দুটি দল মুখোমুখি হল। নদীয়ার গায়ে ছিল মেরুন ও ২৪ পরগণার সবুজ-সাদা বর্ডার দেওয়া জার্সি। খেলার চার মিনিটের মাথায় অঘটন ঘটালে নদীয়ার দীপক দত্ত। সুন্দর ভাবে সে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়ে ও চমৎকার সটে প্রথম গোল করে নদীয়াকে এগিয়ে দেয়। ১১ ও ১২ মিনিটের মাথায় নদীয়ার ফরোয়ার্ডরা পরপর দুটি অব্যর্থ গোল মিস করে। ১৭ মিনিটের মাথায় ২৪ পরগণার প্রথম সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি সমীর ঘোষ। তারপর কিছুক্ষণ মাঠে ২৪ পরগণা প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেও গোল পায়নি। প্রথমার্ধে ফল নদীয়া (১-০)।

দ্বিতীয়ার্ধে ২৪ পরগণা একের পর এক নদীয়া গোলমুখে হানা দেয়। নদীয়ার ডিফেন্স দিশেহারা হয়ে পড়লেও ২৪ পরগণার ফরোয়ার্ডরা ব্যর্থ হয় গোল করতে। খেলা শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে নদীয়া দ্বিতীয় গোল করে দর্শকদের সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটায় এবং সেই সঙ্গে জুনিয়র ট্রফি ঘরে তোলার পথ পরিষ্কার করে। সুজিত সিনহার কাছ থেকে বল পেয়ে প্রসাদ তরফদার চমৎকার গোল করে। দর্শকেরা মাঠে ঢুকে কিছুক্ষণ খেলার ব্যাঘাত ঘটায়। দর্শকদের জন্য দু দলের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। ফেন্সিং টপকে কয়েকজন দর্শক মাঠে সাইড লাইনের ধারে বসে পড়ে। দর্শকদের ভিড় সামলাতে পুলিসকেও হিমসিম খেতে হয়েছে বার বার। খেলায় রেফারিং-এর মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। বাঁকুড়ার রেফারি তরুণ চ্যাটার্জি ভাল খেলিয়ে দর্শকদের সুখ্যাতি কুড়ান। খেলা শেষে দর্শকেরা রেফারিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন—এমন দৃশ্য আজকাল দেখাই যায় না। আজকের খেলায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেলেন নদীয়ার অধিনায়ক প্রসাদ ঘোষ। স্থানীয় বিশ্বকর্মা ওয়ার্কশপ তাকে ট্রাক সুট উপহার দেয়। আর একটি সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেলেন ২৪ পরগণার অধিনায়ক দেবাশিস দত্ত।

ফাইনালে দু'দলে খেলেছে :

নদীয়া : সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, প্রণয় ঘোষ (সুকান্ত বক্সি), তরুণ রায়, প্রসাদ ঘোষ, প্রদীপ মণ্ডল, স্বপন কান্তি নাথ, সুজিত কুমার সিনহা, নির্মল ভৌমিক, দীপক দত্ত, সুপ্রিয় চক্রবর্তী, প্রসাদ তরফদার

২৪ পরগণা : সুমিত মুখার্জি, অঞ্জন নাথ, অনিমেষ চক্রবর্তী, শৈবাল নিয়োগী, পৃথিজিৎ ব্যানার্জি, অভিজিৎ ঘোষ (রণধীর মজুমদার), নিতাই দে, সুরজিৎ ঘোষ, দেবাশিস দত্ত, সমীর ঘোষ ও বিজয় মিত্র।

ফাইনাল খেলাটি ছাড়া এবারের আন্তঃ-জেলা জুনিয়র ফুটবলের বেশ কয়েকটি খেলাতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা গেছে। ১০ আগস্ট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী খেলায় গতবারের রানার্স হাওড়া জলপাইগুড়িকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়। জলপাইগুড়ির গোলরক্ষক দীপক সরকারের দৃঢ়তায় গোলের সংখ্যা আর বাড়েনি। অপূর্ব খেলেছে দীপক। প্রতিযোগিতার সেরা গোলকিপিং করেছে সে। হাওড়ার দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী দুটি গোল করে। জলপাইগুড়ির পক্ষে গোলটি দেয় দুর্গা সেন।

১১ আগস্ট নদীয়া দার্জিলিং-কে ১-০ গোলে পরাজিত করে। খেলা শেষ হওয়ার ঠিক দু' মিনিট আগে স্বপনকান্তি নাথের উঁচু সট গোলে ঢোকে। সারা খেলায় দার্জিলিং খুব কম করেও চারটি অব্যর্থ সুযোগ নষ্ট করেছে।

১২ আগস্ট বাঁকুড়া হুগলীকে ২-০ গোলে হারিয়ে দেয়। বাঁকুড়ার পক্ষে গোল দুটি করে অধিনায়ক কমল ঘোষ ও সুকান্ত সরকার। তাদের গোলরক্ষক রঘুনাথ পাল ছিল সেরা খেলোয়াড়। ১৩ তারিখে নদীয়া হাওড়াকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। হাওড়ার দুর্ভাগ্য, তারা সারা খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেও জয় পায়নি। প্রথমার্ধে হাওড়া যখন নদীয়ার গোলমুখে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখন নদীয়ার সুপ্রিয় চক্রবর্তী গোল করে দলকে সেমি-ফাইনালে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১৪ আগস্ট উদ্যোক্তা জেলা মানভূম (পুরুলিয়া) মালদহকে ন্যূনতম গোলে হারিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে গোল করে বাজার মাঝি। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দর্শক-পূর্ণ জেলা স্টেডিয়ামে বাঁকুড়া পুরুলিয়াকে দুই গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দেয়। প্রথমার্ধের তিন মিনিটে মিলন ঘোষ ও হাফটাইমের তিন মিনিট পূর্বে তারাশঙ্কর ব্যানার্জি গোল করে। পুরুলিয়া তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। তাদের ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতা দলকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। ১৬ই মেদিনীপুর তাদের প্রথম খেলায় মুর্শিদাবাদকে (৪-০) গোলে হারায়। প্রথমার্ধে অচিন্ত্য ভট্টাচার্য দুটি ও ইউসুফ আলি ও দ্বিতীয়ার্ধে অনুপ সাহা গোল করে।

১৭ তারিখে প্রথম সেমিফাইনালে বাঁকুড়াকে নদীয়া ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠল। নদীয়া সুসংবদ্ধ দল হিসাবে খেলে প্রথমার্ধের ১৫ ও ২৪ মিনিটের মাথায় প্রসাদ তরফদার ও দীপক দত্তের গোলে এগিয়ে যায়। ভিজে মাঠে শেষ দিকে বাঁকুড়ার ছেলেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। খেলা শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মাথায় অব্যর্থ গোলের সুযোগটি বাঁকুড়া কাজে লাগাতে পারলে খেলার ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

১৮ আগস্ট চন্দননগর কোচবিহারকে ২-০ গোলে হারিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে চয়ন দত্ত চৌধুরী ও দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে নরেন মুখার্জি গোল করে। পরের দিন পশ্চিম-দিনাজপুর বর্ধমানকে এক গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। খেলায় ৬০ মিনিটের মাথায় সম্পৎ দাসের মারা বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে বর্ধমানের স্টপার সুব্রত সিনহা গোলে মেরে বসে।

২০ তারিখে প্রতিযোগিতার দীর্ঘস্থায়ী খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর অতিরিক্ত সময় খেলে শেষ পর্যন্ত চন্দননগরকে (৪-২ গোলে) হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকে। দু দলের পক্ষে দুটি করে গোল করে অচিন্ত্য ভট্টাচার্য (মেদিনীপুর) ও দেবোপম ঘোষ (চন্দননগর)। খেলায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। দর্শক গ্যালারি থেকে মাঠে ইঁট পড়ে। লাইন্সম্যান সামান্য আহত হন। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে মেদিনীপুরের তপন দে ও চন্দন পানিগ্রাহী পরপর দুটি গোল করে দলের জয়লাভ সহজ করে তোলে।

২১ আগস্ট গতবারের বিজয়ী বীরভূমকে ২৪ পরগণা ৩-১ হারিয়ে দেয়। বীরভূম খুব দুর্বল দল নিয়ে মাঠে নামে। গোলদাতা ২৪ পরগণার পক্ষে সমীর ঘোষ দুই ও দেবাশিস দত্ত এবং বীরভূমের পক্ষে পার্থ সাহা। পরদিন ২৪ পরগণা পশ্চিম দিনাজপুরকে (২-০) গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে। পশ্চিম দিনাজপুর ভাল খেলে শক্তিশালী দলের কাছে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ২৪ পরগণার মুখ রেখেছে যারা তারা হল সমীর ঘোষ ও নিতাই দে।

২৪ আগস্ট দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২৪ পরগণা মেদিনীপুরের সম্মুখীন হয়। ফাইনাল ২৪ পরগণা ও নদীয়ার মধ্যে হলেও অনেকে এই খেলাটিকে ফাইনাল খেলা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ২৪ পরগণা দল তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলে শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরকে তিন গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। প্রথমার্ধে তারা এক গোলে এগিয়ে ছিল। ১৪ মিনিটে গোল করে বিজয় মিত্র। জটলার মধ্য থেকে বিজয় জালে বল ঠেলে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে সমীর ঘোষ ও বিজয় মিত্র আবার গোল করে। খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেদিনীপুরের ছেলেরা সমান তালে আক্রমণ চালিয়ে গেছে। প্রতিযোগিতার সেরা খেলাগুলির মধ্যে এই খেলাটি অন্যতম।

আন্তঃজেলা সাব- জুনিয়র ফুটবলে বিজয়ী মেদিনীপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেদিনীপুর জেলার ছেলেরা বালুরঘাটে আয়োজিত আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়র ফুটবলের ফাইনালে হুগলী জেলা দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গোল করেছে মেহতাব হোসেন তিনটি ও একটি করে অরুণ সাহা ও ধনরাজ মল। মেহতাব ও অপর খেলোয়াড় গৌতম মালাকার রেলওয়ে দলের হয়ে সাব-জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে ভাল খেলে। ফলস্বরূপ তারা ভারতীয় ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে।

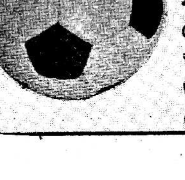
মেদিনীপুরের ছেলেরা এবার চারটি খেলায় ১৮টি গোল করে রেকর্ড করেছে। মেদিনীপুরে ছাঁটাই পর্বের খেলায় তারা বাঁকুড়াকে ৬-০ ও ২৪ পরগণাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়। মালদহের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পায়। সেমি-ফাইনালে মেদিনীপুর গতবারের বিজয়ী হাওড়াকে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। মেদিনীপুরের ৮ জন সাব-জুনিয়র ফুটবলার বোলপুরে বাংলা গ্রামীণ ফুটবল ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে। সাব-জুনিয়র দল গঠনের জন্য যে তিনজন কোচ ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তারা : স্বপন চক্রবর্তী, অশোক ঘোষ ও অজিত কর। মেদিনীপুরের পক্ষে যারা সাব-জুনিয়র ফাইনালে খেলেছে —সৌমিত্র দে, দেবাশিষ মুখার্জি, গৌতম মালাকার, প্রদীপ বাঁকুরা, দীপঙ্কর দাস, টি শ্রী নিবাসন রাও (অধিনায়ক), চিন্ময় পাল (জে ডি সিলভা) (মৃণাল দাস), ধনরাজ মল, অরুণ সাহা, মেহতাব হোসেন ও মানস পিল্লাই। এদের প্রত্যেককে মেদিনীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা ৫ সেপ্টেম্বর অরবিন্দ স্টেডিয়ামে সম্বর্ধনা জানায় ও পুরস্কৃত করে।

ফুটবলে মেখলিগঞ্জ

সংবাদদাতা : সদ্য সমাপ্ত 'নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাব' আয়োজিত বীরেন্দ্র স্মৃতি ফুটবল লিগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নয়টি দলের মধ্যে মেখলিগঞ্জ 'জুডিশিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব' কোন পয়েন্ট না হারিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই লিগে পরবর্তী স্থানাধিকারী দল 'রণজিৎ মেমোরিয়াল ক্লাব' প্রথম দিকে ভাল খেলেও শেষ পর্যন্ত ৪—২ গোলে হারে। মেখলিগঞ্জ 'জুডিশিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব'-এর সঙ্গে 'রণজিৎ মেমোরিয়াল ক্লাব'-এর চূড়ান্ত এই খেলাটি প্রতিটি দর্শকের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়। লাইন্সম্যানদের সহায়তায় এবং রেফারি কৃষ্ণ গোপাল সিং-এর সুনিপুণ পরিচালনায় চূড়ান্ত খেলাটির সমাপ্তি ঘটে। খেলা শেষে স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এন কে দাস পুরস্কার বিতরণ করেন।

এই লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেন জুডিশিয়ালের সঞ্জীব কুমার চৌধুরী এবং বিভিন্ন দলের বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়চন্দ্র দাস, অশোক দে সরকার, আবীর সেনগুপ্ত, দুলাল দাস, কল্লোল গুহ, রানা ঘটক, কমল রায়, মানিক দত্ত, শ্যামল শীল, শিবু বোস, কানু ব্যানার্জি ও শম্ভু রায়ের খেলা দর্শকদের আনন্দিত করেছে।

লিগ টেবল



ক্লাবের নাম	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	পয়েন্ট
জুডিশিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব	৮	৮	—	—	১৬
রণজিৎ মেমোরিয়াল ক্লাব	৮	৭	১	—	১৪
মেখলিগঞ্জ হাইস্কুল-বি	৮	৫	৩	—	১০
নিজ তরফ এ ডি সি	৮	৪	৩	১	৯
মৃগীপুর ক্লাব	৮	৩	৪	১	৭
মেখলিগঞ্জ হাইস্কুল-এ	৮	৩	৫	—	৬
অনামিকা ক্লাব	৮	২	৬	—	৪
ডাঙ্গার হাট ক্লাব	৮	১	৬	১	৩
ভেটারেন্স ক্লাব	৮	১	৬	১	৩

ইয়ুথ ক্লাব চ্যাম্পিয়নঃ নাটকীয় পরিস্থিতিতে লিগ শেষ হল

আগরতলা থেকে অরুণাভ রায়ঃ নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে শেষ হল এবারকার স্থানীয় ফুটবল লিগ। লিগের শুরু থেকে শেষ সবটাই যেন এক দীর্ঘ নাটক। বহু তর্ক-বিতর্কের মধ্যে লিগ শুরু, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা মাঝ পথে ভণ্ডুল হয়। প্রথম খেলার পরেই ঐতিহ্যশালী পুলিশ দলের লিগে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা, রেফারিদের ধর্মঘট, তাছাড়া টি এফ এ-র নির্বাচন, সব মিলে একটা দীর্ঘ নাটক। আর লিগ নির্ধারণী খেলাতেও আরও বেশী নাটক জমে ছিল। লিগ নির্ধারণী খেলায় অংশ-গ্রহণ করেছিল গতবারের অপরাজিত রানার্স ইয়ুথ ক্লাব এবং এবারের লিগের অন্যতম দাবিদার (ওই খেলা পর্যন্ত অপরাজিত) ফরোয়ার্ড ক্লাব। লিগ নির্ধারণী খেলার আগে দুই দলের অবস্থা ছিল—ইয়ুথের ১১টি খেলায় ৯টিতে জয়, ১টি ড্র এবং ১টিতে পরাজয়। মোট পয়েন্ট ১৯। অন্যদিকে ফরোয়ার্ডের ১১টি খেলায় ৯টিতে জয় এবং ২টি ড্র, কোন পরাজয় নেই। মোট পয়েন্ট ২০। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে ড্র করলেই চলে। অন্যদিকে চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরে তুলতে হলে ইয়ুথকে জিততেই হবে। স্বভাবতই এই লিগ নির্ধারণী খেলার গুরুত্ব দুই দলের কাছে ছিল জীবন মরণ সংগ্রাম। তাছাড়া স্থানীয় লিগে এই দুই দলের কেউই এর আগে লিগ জয়ের স্বাদ পায়নি। এদিক থেকেও গুরুত্ব কম ছিল না।



সর্বাধিক গোলদাতা — স্বর্ণ লামা

দুই দলের খেলা ১৪ আগস্ট আলোর অভাবে নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন ইয়ুথ ২—০ গোলে এগিয়ে ছিল। অসমাপ্ত খেলা আবার দেওয়া হল ২৬ আগস্ট। খেলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণ,প্রতি আক্রমণ হলেও ইয়ুথ সেই ১৪ আগস্টের মত খেলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে ইয়ুথ অবশ্য একটু চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ফরোয়ার্ড ক্লাবের লক্ষ্য ড্র করার দিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি নিজেদের ভুলের জন্যই। খেলা শেষ হতে তখন মাত্র ৪ মিনিট বাকি। রাইট ইন আনী শোপের একটা ফাউলকে কেন্দ্র করে মাঠে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আর ইয়ুথও এই ফাঁকে চাপ সৃষ্টি করে এবং পর পর তিন তিনটি কর্নার পায়। তৃতীয় কর্নার করতে যাচ্ছে রাইট ব্যাক চন্দন ধর, খেলা শেষ হতে মাত্র দেড় মিনিট বাকি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন টি এফ এ-র প্রাক্তন সম্পাদক রণজিত ভট্টাচার্য। তিনি বলে উঠলেন, 'দেখবে এক্ষুণি গোল হবে।' কর্নার কিক আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিতিশ দেবনাথ বল জালে ঢুকিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিলেন। বোঝা গেল সবই অভিজ্ঞতা। সেদিনকার সেই শেষ নাটক অনেক দর্শক বা সমর্থকের দেখা হয়ে উঠেনি। ঘটনাটি উল্লেখ না করলে নাটক অসমাপ্ত রয়ে যাবে। খেলা শেষ হতে তখন মাত্র পাঁচ মিনিট। ফরোয়ার্ডের অভিজ্ঞ লেফট আউট আবদুল গফুর ইয়ুথের দুই তিন জন ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে নিয়ে সামনে শুধু অসহায় গোলরক্ষক অনাথ শীলকে পেয়েও গোল করতে পারেনি। এ দুঃখ গফুরের বহুদিন মনে থাকবে! মনে থাকবে ক্লাব সমর্থকদেরও। কারণ এ গোল হলে নিশ্চয়ই চ্যাম্পিয়নশিপ ফরোয়ার্ডের ঘরে যেত। খেলার সেই মুহূর্তে সবাই ধরে নিয়েছিল খেলা ড্র। ইয়ুথ এবং ফরোয়ার্ডের অনেক সমর্থকেরই দেখা হয়নি নিজ দলের জিত বা হার। কারণ ভীড় এড়াতে অনেকেই মাঠের বাইরে চলে এসেছিলেন। ইয়ুথ অবশ্য যোগ্য দল হিসাবেই জয়ী হয়েছে। অবশ্য সেদিনকার 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' আখ্যা দেওয়া হয় ফরোয়ার্ডের শেষ প্রহরী কাজল দাসকে। কাজল দাসকে হারাতে পারেনি ইয়ুথের বাঘা বাঘা ফরোয়ার্ড, স্বর্ণ লামা, রামকুমার লামা, ফণীন্দ্র মালাকার। অবধারিত চার চারটি গোল



এবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন ইয়ুথ ক্লাব ছবিঃ তপন সেন

রক্ষা করেছে কাজল।

ইয়ুথ কিভাবে চ্যাম্পিয়নশিপ পেল ঃ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ৩—১, বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২—০, আনন্দ ভবনকে ৪—১, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নকে ৫—০, এগিয়ে চল সঙ্ঘকে ৪—১, মৌচাককে ২—০, গতবারের চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথকে ২—০ গোলে এবং নাইট বুলেটকে ১০—০ গোলে হারিয়ে এক রেকর্ড গড়েছে। ড্র করেছে লালবাহাদুরের সঙ্গে ১—১ গোলে। একটি মাত্র খেলায় হেরেছে টাউন ক্লাবের সঙ্গে ১—০ গোলে। পুলিশের বিরুদ্ধে ওয়াক-ওভার পেয়েছে।

লিগে রানার্সের প্রশ্নে দুটি দল রয়ে গেল। ফরোয়ার্ড এবং ব্লাড মাউথ। দু'দলই ৪টি করে পয়েন্ট নষ্ট করেছে। টি এফ এ সূত্রে জানা গেছে এক্ষেত্রে যুগ্ম রানার্স হবে।

গোলের দৌড়ে এবার ইয়ুথ ক্লাবের তিন ফরোয়ার্ড ছিল। স্বর্ণ লামা—১০, রামকুমার—৯ এবং ফণীন্দ্র মালাকার—৮। স্বর্ণ লামা এবার আগরতলার দর্শকদের খুব আনন্দ দিয়েছে। ফরোয়ার্ডের সব গুণ তার রয়েছে। সবচেয়ে বড় গুণ খুব শান্ত মেজাজ। খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সময় হলেও ফণীন্দ্র মালাকার এবার দর্শকদের বেশ আনন্দ দিয়েছে।

লিগ জয়ের পর এক সাক্ষাতকারে ক্লাবের অধিনায়ক অনাথ শীল জানাল, 'প্রথম লিগ পেয়েছি। প্রত্যেকেই খুব খেটে খেলেছে। লিগ জয়ে আমি আনন্দিত কিন্তু ব্যালান্স টিম নিয়েও টাউন ক্লাবের সঙ্গে আমাদের হারা ঠিক হয়নি।'

'খেলার আসরের তরফ থেকে ক্লাব সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালকে অভিনন্দন জানাতে যেতেই বললেন, 'ত্রিপুরার খেলাধূলা নিয়ে খেলার আসরের ভূমিকা প্রশংসনীয়। লিগ সাফল্য,এ আমার একার নয় ক্লাবের সবার, গ্রামের ছেলেদের নিয়ে খেটেছি, আজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, মনে খুব আনন্দ। আমাদের অনেকের সাফল্যের পর ফুটবল কোচ বিমল রায়চৌধুরীর কথা মনে পড়ছে, কারণ তিনিই আমাদের 'এ ডিভিসনে' খেলতে বিশেষ উৎসাহিত করেন।

২৪ পরগণার সাঁতারে শ্যামনগর ও ক্যানিং-এর ছেলেমেয়েদের সাফল্য

উত্তর ২৪ পরগণার প্রতিনিধি ঃ ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে শ্যামনগরে অন্নপূর্ণা কটন মিলস-এর পুকুরে সারাদিনব্যাপী বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবার ১১০ জন প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিল। এরমধ্যে মেয়ে ২৪ জন। আশানুরূপ প্রতিযোগীর অভাবে ঘোষিত ৪২টি ইভেন্টের মধ্যে ১০টি বাতিল হয়।

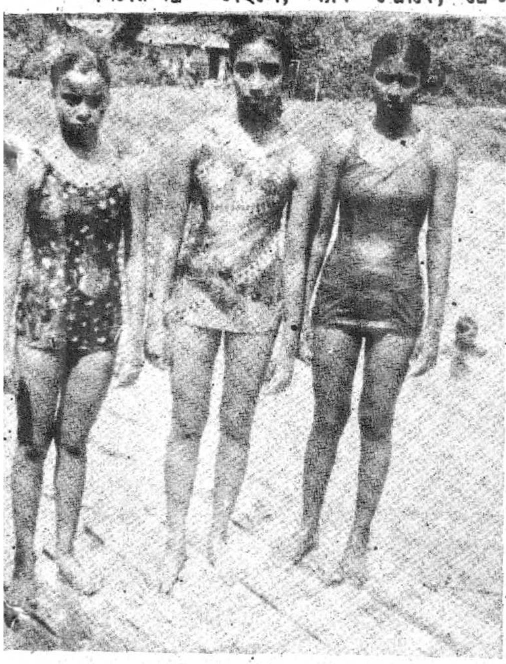
বিভিন্ন এজ গ্রুপে বালকদের ১৪টি, বালিকাদের ৯টি, পুরুষদের ৬টি ও মহিলাদের ৩টি ইভেন্টে ভাগ করে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কয়েকটি ইভেন্টে ভারতী বৈরাগী, সীমা রায়, সুচিত্রা সরদার, তপন চক্রবর্তী, ডি সিংহরায়, পরিতোষ হালদার কৃতিত্বের নজীর গড়েছে। সর্বোপরি ক্যানিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য কেয়া দাস ১০ বছরের নিচের গ্রুপে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে, ব্যাক স্ট্রোকে, ব্রেস্ট স্ট্রোকে ও ৫০ মিটার বাটার ফ্লাইয়ে প্রথম স্থান দখল করে সকলকে অবাক করেছে।

পুরুষ ও মহিলা বিভাগে শ্যামনগর সুইমিং ক্লাব ৪০ পয়েন্ট ও ক্যানিং রিক্রিয়েশন ক্লাব ২৪ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ন হল।

প্রধান অতিথি অতীতের কৃতী সাঁতারু শচীন নাগ ও এন আই এস-এর কোচ নির্মল ব্যানার্জি সাঁতারের উপোযোগিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। জেলা ক্রীড়া পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক বিজয় গাঙ্গুলি জানান, ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া পর্ষদ বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত সংস্থা হয়েও সাঁতারে বড়ই উপেক্ষিত। আজ পর্যন্ত শ্যামনগরে সুইমিং পুলটি নির্মাণ হল না। এমনকি কটন মিলস-এর পুকুরটিও ঠিক মত সার্ভে হয়নি। ফলে এবারও যে সকল প্রতিযোগী এই আসরে রাজ্য রেকর্ড স্পর্শ করল বা ভাঙল তার সময় ত্রুটিপূর্ণ বলাই বাহুল্য। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্যামনগর সুইমিং ক্লাবের সম্পাদক শম্ভুনাথ দে, জেলা ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি রমারঞ্জন ঘোষাল প্রমুখ। সমস্ত অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন শ্যামনগর সুইমিং ক্লাবের সদস্যরা।



১০০ মিটার বাটার ফ্লাইয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী যথাক্রমে তপন চক্রবর্তী, ডি সিংহরায় ও পরিতোষ হালদার



১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ১ম, ২য় ও ৩য় যথাক্রমে ভারতী বৈরাগী, সীমা রায় ও সুচিত্রা সরদার



১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে মেয়েরা ডাইভ দিচ্ছে ছবি ঃ বাদল হালদার



হুইলচেয়ারে সিডনিতে পৌঁছানোর পর ফ্রেডকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন স্ত্রী ডায়না

হুইলচেয়ারে ৫৬৩ মাইল

বিশেষ প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়ার পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্পোর্টসম্যান ফ্রেড পয়েন্টার তার হুইলচেয়ারে মেলবোর্ন থেকে সিডনি ৯০৭ কিলোমিটার (৫৬৩ মাইল) পথ পাড়ি দিলেন মাত্র ৭৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে। অবশ্য এক নাগাড়ে নয়, কেবলমাত্র দিনের আলোয় ফ্রেড হুইলচেয়ার চালিয়েছেন। এভাবে দশটি দিন চলে তিনি গত ৮ জুন সিডনি পৌঁছান, নির্দিষ্ট দিনের ছ'দিন আগে।

ফ্রেড গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ১২·৪ কিমি (অর্থাৎ ৭·৭ মাইল) গতিতে এই পথ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে উৎরাই পথে তার হুইলচেয়ারের গতি ছিল ঘণ্টায় ৬০ কিমি (অর্থাৎ ৩৭ মাইল)। সত্যিই অভাবনীয়।

সিডনীতে তাকে ১০০০ অস্ট্রেলিয় ডলারের একটি চেক উপহার দেওয়া হয়। কারণ ফ্রেড-এর এই অভিযানের উদ্দেশ্যই অর্থ সংগ্রহ। আগামী জুনে তিনি হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠেয় পঙ্গুদের ওলিম্পিকে যোগ দিতে চান। আর সেজন্য চাই এক লক্ষ অস্ট্রেলীয় ডলার। সিডনির মার্টিন প্লাজায় পৌঁছনোর পর তিনি প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজার-এর অভিনন্দন বার্তাও পান।

তেত্রিশ বছর বয়সী ফ্রেড ১৯৬৭ সালে মোটর দুর্ঘটনা নিম্নাঙ্গ পঙ্গু হওয়ার আগে রীতিমত উঁচুদরের স্পোর্টসম্যান ছিলেন। বাস্কেটবল, তীরন্দাজী, ভারোত্তোলন, টেবল টেনিস, জ্যাভেলিন, সটপুট ও দৌড়ে এবং পঙ্গুত্বকালে হুইলচেয়ার চালানোর বিভিন্ন রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে ফ্রেড সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ২০টি পদক জয় করেছেন।

একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা হুইলচেয়ারে ২৪৬·৮ কিমি (১৫৩ মাইল) পথ অতিক্রমের রেকর্ড করেছেন তিনি। তার এই ৯০৭ কিমি পথ অতিক্রমও বিশ্বরেকর্ড। কিন্তু 'গিনেস রেকর্ডবুকে' তা স্থান পাবে না, কারণ পঙ্গুদের বিশ্বরেকর্ড এই বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় না। ●

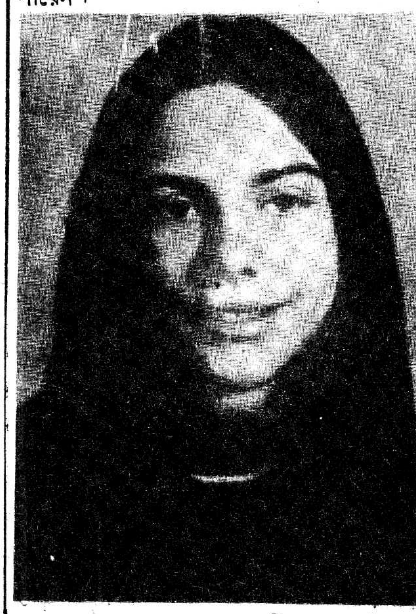
খেলায় খরচ করুন : উৎপাদন বাড়ান

জার্মানির কোলোন শহরে 'ফোর্ড' ফ্যাক্টরির ৫৬ হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় আট হাজার কর্মীই কাজের ফাঁকে নিয়মিত খেলা-ধূলায় অংশ নেয়—মূলত জিমন্যাস্টিকস ও টেবল টেনিস-এ। দীর্ঘ বিশ্রামের সময় কোম্পানির ব্যবস্থাক্রমে অনেকেই খেলে ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি।

স্পোর্টস মেডিসিন, সাইকোলজিস্ট ও কর্মচারী-বীমা কোম্পানির মতে কর্মচারীদের স্পোর্টসের জন্য অর্থের এক ইউনিট খরচ করলে তা দশগুণ হয়ে ফেরত আসে। এই আপ্তবাক্যটি নিশ্চয় সব দেশের সব কর্মচারীর পক্ষেই খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় মালিকরা কি এব্যাপারে কিছু ভাবছেন ?

কানাডা থেকে প্রকাশিত 'রেসলিং রিভিউ' পত্রিকায় পাঠকের কলমে এক কিশোরীর চিঠি :

'আমার নাম ন্যানেট গেলিং, আমার জীবনের লক্ষ্য কুস্তিগীর হওয়া। ...এমন কোন পেশাদার কুস্তিগীর যদি কেউ থাকেন, যিনি আমাকে তালিম দিয়ে কুস্তিগীর করে তুলতে পারেন, তবে তার বাকি জীবনের জন্য একজন বিশ্বস্ত, গুণবতী বন্ধু হিসাবে আমাকে পেতে পারেন।



আমার সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য : উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, ওজন ১০৫ পাউণ্ড।

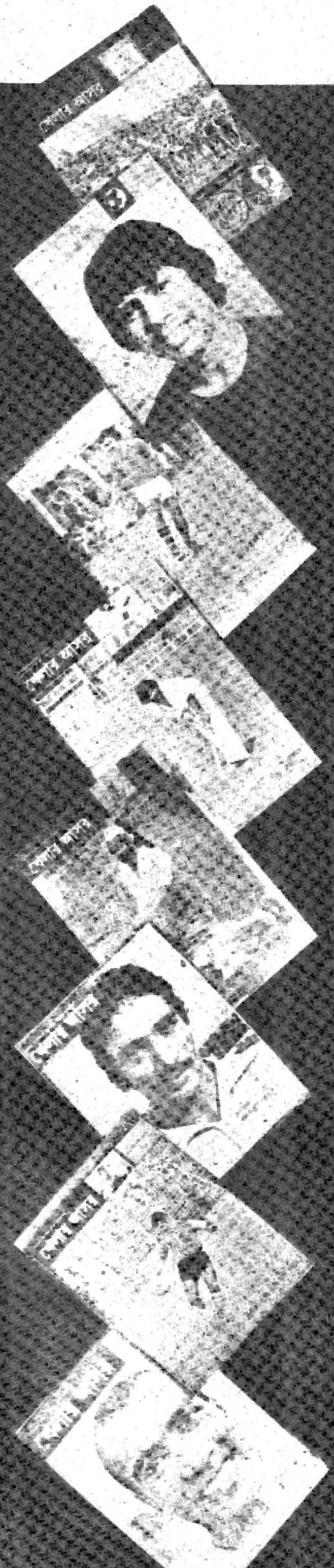
পুরুষ বা মহিলা, পেশাদার বা অপেশাদার নির্বিশেষে যে কোন কুস্তিগীরের কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম। অথবা কুস্তিতে আগ্রহ আছে, কিন্তু নিজে কুস্তিগীর নন, তিনিও চিঠি দিতে পারেন। সব চিঠির উত্তর দেওয়া হবে।'

বিনামূল্যে সারাজীবন

খেলার আসর

পড়ুন

আপনি কি সারাজীবন বিনামূল্যে খেলার আসর পড়তে চান ? তাহলে আজই ৪০০.০০ টাকা পাঠিয়ে 'আজীবন গ্রাহক' হোন। 'আজীবন গ্রাহক'রা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পত্রিকা পাবেন। পাবেন প্রতিটি বিশেষ সংখ্যা এবং শারদীয়া সংখ্যাও।



১। আজীবন গ্রাহক চাঁদা তিনভাবে দেওয়া যেতে পারে :—

ক) এককালীন ৪০০ টাকা, অথবা

খ) প্রথমে ১০০ টাকা দিয়ে সদস্যভুক্তির পর পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে বাকি তিনশো টাকা তিন কিস্তিতে জমা দিতে পারেন, অথবা

গ) প্রথমে ৫০ টাকা দিয়ে সদস্যভুক্তির পর পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বাকি চারশো টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে পারেন। কয়টি কিস্তিতে দিতে চান, তা আবেদনপত্রে উল্লেখ করে দেবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে মোট ৪৫০ টাকা দিতে হচ্ছে। একটি কিস্তি থেকে আরেকটির ব্যবধান তিন মাসের বেশী হওয়া চলবে না।

২। এককালীন বা কিস্তি যেমনভাবেই টাকা দিন ; আপনার সদস্যভুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আপনি পত্রিকা পেতে থাকবেন। টাকা জমা দিতে হবে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান—**ইস্টার্ন হরাইজন, ৭, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৩।** কিন্তু চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, মনিঅর্ডার পাঠাতে হবে 'ইত্যাদি প্রকাশনী'র নামে।

৩। সদস্যভুক্তির এক বছর বাদে আপনি যে কোন সময় সদস্যপদ প্রত্যাহার করে, দাবি মাত্র টাকা ফেরৎ নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে পুরো গ্রাহক চাঁদা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনার নাম সদস্য তালিকা থেকে বাদ যাবে।

৪। ইত্যাদি প্রকাশনী যদি মনে করে, তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক তালিকা থেকে কারুর নাম বাতিল করে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার পুরো চাঁদা (৪০০ / ৪৫০ টাকা) ফেরৎ পাবেন।

৫। আবেদনপত্রে উল্লিখিত কোন কিস্তির টাকা যদি না দেন, তবে বই পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং আবার কিস্তির টাকা আমাদের কাছে পৌঁছনোর পর থেকে বই পাঠানো শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো পাঠানো সম্ভব নয়। এক বছরের মধ্যে পুরো টাকা না পেলে গ্রাহক তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে এবং প্রদত্ত সংখ্যাগুলির দাম গ্রাহক চাঁদা থেকে বাদ দিয়ে টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

৬। প্রতিটি আজীবন গ্রাহককে সদস্যভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কুপন বই সরবরাহ করা হবে। এই বই থেকে যে কুপন যে সংখ্যার জন্য চিহ্নিত, সেই কুপন প্রতি সপ্তাহে 'খেলার আসর' নেবার সময় এজেন্টকে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৭। ঠিকানা পাল্টালে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন, অন্যথায় পরে অসুবিধে দেখা দিলে দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে।

৮। কুপন বই হারালে বা আপনার অসাবধানতায় কোন ক্ষতি হলে সে দায়িত্ব আপনার।

৯। আবেদনপত্রের সঙ্গে গ্রাহক চাঁদা এবং সদস্যভুক্তি বাবদ এককালীন ১০ টাকা জমা দিতে হবে। এই ১০ টাকা কিন্তু ফেরৎযোগ্য নয়।

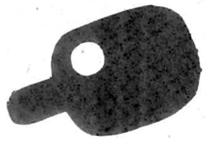


তিন দশকে টেবল টেনিসে আমাদের মেয়েরাও শিল্প থেকে বিজ্ঞানে পৌঁছেছে

শকুন্তলা সেন

১৯৫০ থেকে ১৯৭৯। এই তিন দশকের মধ্যে বিশ্ব টেবল টেনিস ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের খেলায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। অতীতে টেবল টেনিস খেলা ছিল ধীর, স্থির, মন্থর। বলের ধ্বনির সঙ্গে খেলোয়াড়রা ছিলেন সুপরিচিত। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খেলারও পরিবর্তন ঘটেছে। বিমানের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেবল টেনিসও যেন দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান জেট বা সুপারসনিক যুগের পটভূমিকায় টেবল টেনিস খেলার গতি হয়েছে দ্রুত এবং বলের ধ্বনিও ক্রমশ মুখর থেকে মূক হয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। অতীতে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক খেলা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমান খেলায় বিশেষ করে পেন হোল্ড গ্রিপের খেলায় রক্ষণাত্মক বা ডিফেন্সিভ খেলা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং খেলোয়াড়ের ভাগ্য নির্ণয়ে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ প্রধান হাতিয়ার রূপে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব টেবল টেনিস ক্রীড়াঙ্গনে যে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে, ভারতে তার প্রভাব এখনও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই, পঞ্চাশ দশকে ভারতের রক্ষণাত্মক বা ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়দের যে একাধিপত্য দেখা গেছে, সত্তরের দশকে তা কিছু কম হলেও একেবারে মুছে যায়নি।

পঞ্চাশ দশকে ভারতীয় টেবল টেনিসের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী ছিলেন হায়দ্রাবাদের সৈয়দ সুলতানা। তিনি উপর্যুপরি পাঁচ বছর (১৯৪৯—১৯৫৩) মেয়েদের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। ১৯৫৪ সালে জাতীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহারাষ্ট্রের মীনা পারাণ্ডের কাছে পরাজিত হলেও, তার পরাজয়ের শোধ নেন ১৯৫৫ সালের ফাইনালে। এরপর ভারতীয় টেবল টেনিসের রঙ্গমঞ্চে আর তাকে দেখা যায়নি। তিনি ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ সুলতানা প্রধানত রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে খেলতেন। ছোটখাটো দোহারা চেহারার। কিন্তু ব্যাট হাতে নিলে সে অন্য চেহারা। বল থেকে তার ব্যাট যেন অবিচ্ছিন্ন ছিল।



এই সময় আরেকজন খেলোয়াড়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বোম্বাইয়ের গুল ন্যাসিকওয়ালা। ১৯৫২ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় প্রতিযোগিতায় তিনি ত্রিমুকুট জয় করে ভারতীয়দের মধ্যে নতুন রেকর্ড করেছিলেন। মহিলাদের একক প্রতিযোগিতা, মহিলাদের জুটি ও মিশ্র জুটির খেলায় বিজয়ী হয়ে তিনি যে রেকর্ড স্থাপন করেছেন, আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে তা স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি। তিনিও ছিলেন মূলত ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়। দুর্ভেদ্য ছিল তার হাতের চপ-স্ট্রোক। পরবর্তীকালে ১৯৬০-৬১ সালে আবার তাকে ব্যাট ধরতে দেখা গিয়েছিল। তখন তিনি প্রবীণা। কিন্তু সে সময়েও বহু নবীনাকে ঘায়েল করে তিনি কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি পৌঁছেছিলেন।

এদের পরবর্তী খেলোয়াড় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠা মহারাষ্ট্রের মীনা পারাণ্ডে। মীনা যখন ভারতীয় টেবল টেনিসের অপরাজেয় নায়িকা, তখন আর এক মীনা—মীনা শাহ ভারতীয় ব্যাডমিন্টন জগতের একচ্ছত্র নায়িকা ছিলেন। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিলেন দুই মীনা, পারাণ্ডে ও শাহ। পরবর্তীকালে দু'জনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভারতীয় রেল দলের মহিলা দলের অধিনায়িকা ছিলেন। মীনা পারাণ্ডে ছোট নামের মতই ছোট মানুষ। পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, খেলার ভঙ্গী ছিল আক্রমণাত্মক। অফেন্স, ডিফেন্স সব মিলিয়ে খেলার পরিভাষায় যাকে বলা হয় কমপ্লিট খেলোয়াড়। মীনা ছিলেন সে ধরনের খেলোয়াড়। বলের সঙ্গে মিতালী ছিল তার। তার উপরে অপূর্ব বল প্লেসিং। খেলায় বল তৈরি করে বুদ্ধির কৌশলে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। ১৯৫৪ সালে সৈয়দ সুলতানাকে ফাইনালে পরাজিত করে ১৯৫৫ সালে তারই কাছে ফাইনালে হারেন। ১৯৫৬, '৫৮ ও '৫৯ সালের সিঙ্গলস খেতাবের বিজয়িনী ছিলেন মীনা পারাণ্ডে। এছাড়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়িকাও ছিলেন তিনি।

এই সময়ে মাদ্রাজের র‍্যাচেল জন মীনার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। সম্পূর্ণ ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়। বল যত জোরেই এবং যেখানেই থাকুক র‍্যাচেলের ব্যাট থেকে ফেরত আসত। ১৯৫৭ সালে কলম্বোর জাতীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে মীনা পারাণ্ডেকে হারিয়ে বিজয়ী তালিকায় নিজ নাম লিখে গেছেন র‍্যাচেল জন। পরবর্তীকালে বিজয়ী ভারতীয় রেল মহিলা দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন র‍্যাচেল।

মীনা ও র‍্যাচেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরেকজন খেলোয়াড় নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন, তিনি মহীশূরের ঊষা সুন্দরাজ। এখানে উল্লেখযোগ্য, পঞ্চাশ দশকে টেবল টেনিসের রাজ্য সংস্থাগুলি পুরানো রাজ্যের নামানুযায়ী ছিল। পরে ষাট দশকে, বর্তমান রাজ্যগুলির নামানুসারে সংস্থাগুলির নামকরণ করা হয়। ঊষা সুন্দরাজ যখন বালিকা, তখন থেকেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম বালিকা সিঙ্গলসের বিজয়িনী তিনি। কৃশকায়, দীর্ঘাঙ্গী ঊষা সুন্দরাজ সম্পূর্ণরূপে ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়। র‍্যাচেল জনের থেকেও তার চপ-স্ট্রোক প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করে তোলে। ডিপ চপ ও মাঝে মাঝে লুজ চপের মিশ্রণে তার খেলা প্রতিপক্ষর ধৈর্যচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঊষা ১৯৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬ ও ৬৮ সালের জাতীয় প্রতিযোগিতায় সফল বিজয়িনী। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ঊষার কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৬ সালে তাকে 'অর্জুন' পুরস্কার দেয়। ভারতীয় মেয়ে টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে ঊষাই প্রথম 'অর্জুন'। ঊষার বিশেষ কৃতিত্ব, এখনও সত্তর দশকেও, তিনি তার খেলার মান পূর্বের মতই রেখে গেছেন এবং নিজেকে প্রথম সারির খেলোয়াড় হিসাবে প্রমাণ করেছেন। বয়সের দিক দিয়ে বিচার করলে অনেক প্রথম সারির খেলোয়াড় অপেক্ষা ঊষা অন্ততপক্ষে দশ

বছরের বড় হলেও, দক্ষতার সঙ্গে তিনি নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ইতিমধ্যে ১৯৬০ সালে বোম্বাইয়ের প্রিস্কা রোজারিও, ১৯৬৩ সালে মহারাষ্ট্রের নীলা কুলকার্নী ও ১৯৬৭ সালে মহারাষ্ট্রের অলকা ঠাকুর জাতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হলেও পরবর্তীকালে তাদের আর টেবল টেনিস বোর্ডের সামনে দেখা যায়নি। অবশ্য, প্রিস্কা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব নিয়ে চলে যান এবং ১৯৭৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম বিশ্ব টেবল টেনিসের অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে দলের ম্যানেজারের ভূমিকায় তাকে দেখা গিয়েছিল।

পঞ্চাশ দশক থেকে ষাট দশকে এসে টেবল টেনিসে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বুটিদার রবার ব্যাটের স্থান দখল করেছে স্যাণ্ডউইচ ব্যাট। মাঝে স্পঞ্জ ও ওপরে রবারে আচ্ছাদিত ব্যাটের আত্মপ্রকাশে খেলার ধারা সম্পূর্ণ অদল বদল হয়ে গেছে। খেলার মার গেছে বদল হয়ে তার পরিবর্তে স্পিন, জ্যাব ও লুপ ড্রাইভের আবির্ভাব ঘটেছে। স্পিন যার আয়ত্তে, তারই এখন জয় জয়াকার। পঞ্চাশ দশকে বিশ্ব টেবল টেনিসে জাপান ও চীনা দলের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টেবল টেনিস খেলা সম্পূর্ণ অন্য আকার ধারণ করেছে। ভারতে সে পরিবর্তনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল ষাট দশকে। পঞ্চাশ দশকে কোন কোন খেলোয়াড় স্পঞ্জ বা স্যাণ্ডউইচ দিয়ে খেললেও তা ছিল সংখ্যায় অতি নগণ্য। কিন্তু ষাট দশকে খেলা একেবারে বদলে গেল। ব্যাট বলের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল স্যাণ্ডউইচ ব্যাটের আবির্ভাবে। বহু নতুন, সফল খেলোয়াড়ের জন্ম হল।

এদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক মহারাষ্ট্রের (সে সময় থেকে বোম্বাইদল মহারাষ্ট্র নাম নিয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আসছে) কেটি চার্জম্যান। ভারতীয় টেবল টেনিস জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও আধুনিক টেবল টেনিসের ধারক ও বাহক ছিলেন কেটি। স্যাণ্ডউইচ ব্যাটের সদ্ব্যবহার যদি কেউ করে থাকেন, তিনি কেটি চার্জম্যান। ১৯৬৯, ৭০ ও ৭১ সালের জাতীয় প্রতিযোগিতার বিজয়িনী কেটির আবির্ভাব অনেকটা যেন ভিনি, ভিডি ভিসি। এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। অতি সহজে, অনায়াসে তিনি বিজয়িনীর সম্মান অর্জন করেন। কেটি পরবর্তীকালে টেবল টেনিসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ফারুক খোদাইজীর ঘরণী হয়ে ১৯৭৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগের দৈনিক খেলার বিবরণী সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাঠক পাঠিকার সামনে তুলে ধরেন। ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক কেটি চার্জম্যানকে 'অর্জুন' পুরস্কার দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৭ সালে ফারুক খোদাইজীও 'অর্জুন' পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন। সম্ভবত কেটি ও ফারুক খোদাইজী ভারতীয় ক্রীড়া জগতের একমাত্র 'অর্জুন' প্রাপ্ত দম্পতি।

সত্তর দশকে কেটির আশেপাশে আরও কয়েকজন প্রতিভাময়ী খেলোয়াড়ের দেখা পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতমা বাংলার রূপা মুখার্জি। খেলার পরিবেশে জন্ম, খেলাধূলা রূপার রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে। সাতটি ভাইবোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ রূপা, রূপো নামেই দাদা দিদিদের প্রিয়। কালীঘাটের মুখার্জি পরিবার কলকাতার খেলা মহলে সুপরিচিত। সব ভাই-বোনই টেনিস, ক্রিকেট বা টেবল টেনিস, কোন না কোন খেলায় সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছেন। কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে গেছে রূপার কৃতিত্ব। রূপা ১৯৭৩ সালে ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। এছাড়া, বহু আন্তর্জাতিক, আমন্ত্রণমূলক ও বিশ্ব টেবল টেনিসে রূপা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিবাহসূত্রে রূপা এখন কানাডার অধিবাসিনী কিন্তু অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতন খেলাকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। পরম নিষ্ঠাভরে সুদূর বিদেশেও খেলার পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে গেছেন। তার একনিষ্ঠ সাধনার ফলও পেয়েছেন তিনি। কানাডার নামী দামী বাঘা খেলোয়াড়দের অবলীলা ভরে হারিয়ে তিনি হয়েছেন কানাডার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে ভারত ও কানাডার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। ভারতের খেলাধূলার ইতিহাসে রূপার এ কৃতিত্ব রেকর্ড হয়ে রইল।

রূপার শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন মহারাষ্ট্রের ও ভারতীয় রেল দলের শৈলজা সালোখে ও বাংলা ও ভারতীয় রেল দলের ইন্দুপুরী।

শৈলজা সালোখে যেন ঊষা সুন্দরাজের প্রতিচ্ছবি। আকৃতি ও প্রকৃতিতে হঠাৎ যেন দ্বিতীয় ঊষাকে শৈলজার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। সেই একই রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে খেলা। বলের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসা ও ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটানোর খেলা। ঠাণ্ডা মেজাজী, শান্ত প্রকৃতির শৈলজা ১৯৭৪, ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালের ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং টেবল টেনিসে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ১৯৭৬ সালে 'অর্জুন' পুরস্কার পান। এছাড়া, শৈলজা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বর্তমান ভারতীয় মহিলা দলের একজন নির্ভরশীল খেলোয়াড়। গত কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি পৌঁছোন।

ইন্দুপুরী, ভারতীয় টেবল টেনিস জগতের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা, অতি অল্প সময়ে তিনি নামীদামী বাছাই খেলোয়াড়দের হটিয়ে দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেছেন। ১৯৭২ ও '৭৫ সালে তিনি ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। টেবল টেনিস জগতে রূপার পরে তার আবির্ভাব হলেও ১৯৭২ সালে জাতীয় প্রতিযোগিতার আসরের ফাইনালে রূপাকে পরাজিত করে জাতীয় বিজয়িনীদের তালিকায় রূপার আগেই তার নামাঙ্কন করেন। সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার পিয়াং ইয়াঙে অনুষ্ঠিত ৩৫তম বিশ্ব টেবল টেনিসে ইন্দু ও শৈলজার কৃতিত্বে ভারতীয় মহিলা টেবল টেনিস দল দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। ইন্দু অসাধারণ খেলে উপর্যুপরি দুটি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার বিজয়িনী উত্তর কোরীয় বালিকা পাক ইয়াং সুনকে পরাজিত করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পরবর্তী রাউণ্ডের খেলায় ৩-১ গেমে জাপানী খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হন। এছাড়া, ইন্দু ও শৈলজার কৃতিত্বেই ভারতীয় রেল-মহিলা দল ১৯৭৮ সালে আগস্টে চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রেল প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী সোভিয়েত রেল দলকে



রূপা মুখার্জি ও ইন্দুপুরী



মাদ্রাজের ম্যাচের জন্য, মীনা পারাতে ডানদিকে লেখক

ফাইনালে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। বাঁ হাতি খেলোয়াড় ইন্দু। আধুনিক টেবল টেনিসের অধিকাংশ কলা-কৌশল তার আয়ত্তে। কিন্তু বিধি বাম। ইন্দুর স্বাস্থ্য তার খেলার প্রধান অন্তরায়। দুরারোগ্য হাঁপানী রোগের জন্য অনেক সময় খেলা চলাকালীন তিনি রোগের শিকার হয়েছেন। ফলে, শেষরক্ষা আর হয়নি। খেলার টেবিলে ইন্দুর মারমুখী খেলা নিঃসন্দেহে দর্শনীয়।

শৈলজা ও ইন্দুর আশেপাশে বহু নবীনা কিশোরী খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আসামের মোনালিসা বড়ুয়া, মদালসা হাজারিকা, রাজস্থানের শ্রদ্ধা শর্মা, মধ্যপ্রদেশের স্নিগ্ধা মেহতা, মহারাষ্ট্রের ব্যোমা শাহ ও বাংলার দেবযানী বাগচী। আশা করা যায়, এরা ভবিষ্যতে শৈলজা ও ইন্দুর স্থান একদিন পূর্ণ করতে পারবেন। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আধুনিক টেবল টেনিসে এরা নিজেদের দীক্ষিত করে তুলছেন। বহু প্রতিযোগিতায় বয়োঃজ্যেষ্ঠদের পরাজিত করে কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়েছেন।

গত তিনটি দশকের খেলার ধারা বিচার করলে দেখা যায়, আগে খেলা ছিল ধীর স্থির মন্থর শিল্পকলা। বর্তমান যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খেলা হয়েছে বিজ্ঞান।

হমনে ভী কুছ করকে দিখায়েংগে

রাজহরা থেকে গাজী এম আনসার : পায়ে সাদা কেডস, সাদা মোজা, ধবধবে সর্টস আর জিমন্যাস্টিক্স গেঞ্জি পরে ১০/১১ বছরের ফুটফুটে মেয়ে অনীতা খান্না আরো প্রায় ১০/১৫ জন সাথীকে নিয়ে রাজহরা হাই স্কুলের মাঠে বিকেলের ঝলমলে রোদে দৌড়চ্ছিল। দেখতে পেয়েই চলে এল 'জারা বুক জাইয়ে আঙ্কল, হমারে সর অবভি আয়েঙ্গে'।

স্কুলের শারীর শিক্ষা বিভাগের ইনস্ট্রাক্টর কর সাহেব তখন মুখে বাঁশী নিয়ে আরেকটি গ্রুপকে জিমন্যাস্টিক্স শেখাচ্ছেন। শ্রীকর ১৯৭৪ সালে শিবপুরীর তাতিয়া তোপী শারীর শিক্ষা কলেজ থেকে পাশ করে ১৯৭৮ সালে ভিলাই স্টিল প্লান্টে ঢুকেছেন। ইতিমধ্যেই দক্ষ প্রশিক্ষণের গুণে সারা ভিলাই স্টিল বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত স্কুলের নানা বয়সী প্রায় ৪০/৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পি টি ব্যায়াম ইত্যাদি শেখান।

যে সব জিমন্যাস্টিক্স এরা শিখছে তার মধ্যে হ্যাণ্ড স্প্রিং, ব্যাক সামার সল্ট, ব্যাক ফিলিপ, ডাইভ, ফুল ব্যালান্স, হ্যাণ্ড স্প্রিং সামার-সল্ট, বিম ব্যালান্স প্রভৃতি। প্যারালাল বারে আছে আপ স্টার্ট, প্রেস ব্যালান্স, এল ফরমের ব্যালান্স, নানা প্রকারের ল্যাণ্ডিং, পিরামিড তৈরির কর্ড, উইল ইত্যাদি।

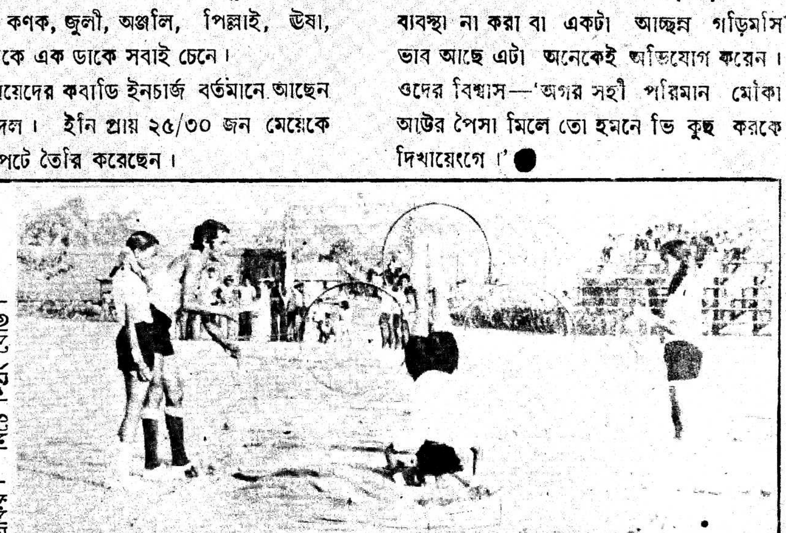
জিমন্যাস্টিক্সের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ কেমন এ প্রশ্নে শ্রীকর জানালেন 'জরা ভী ছুটটি লেনে চাহেঙ্গে তো বাচ্চে লোগ পরেশান কর দেতে হ্যায়। ইতোয়ার ভী হমকো গ্রাউণ্ড আনা জরুরী হ্যায়।' ২৮ বছরের স্লিম চেহারার শ্রীকরকে স্কুলের ফুটবল, হকি, ভলি সব দিকেই নজর রাখতে হয়। অবশ্য শ্রীকর ছাড়া আরো একজন স্পোর্টস টিচার শ্রীচিতলে আছেন। উনি কেবল মেয়েদের খো খো শিখিয়ে থাকেন। খো খো এবং কবাডিতে সারা ভিলাই স্টিল থেকে শুরু করে জেলা ও রাজ্যস্তরে রাজহরা হাই স্কুলের ছাত্রী বন্দনা, কণক, জুলী, অঞ্জলি, পিল্লাই, ঊষা, চামেলীকে এক ডাকে সবাই চেনে।

মেয়েদের কবাডি ইনচার্জ বর্তমানে আছেন শ্রীহরদেল। ইনি প্রায় ২৫/৩০ জন মেয়েকে গড়ে পিটে তৈরি করেছেন।

স্কুলের খাতাপত্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্কুলে হিন্দী ও ইংলিশ মিডিয়াম মিলিয়ে প্রায় দু'হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী। প্রয়োজনের তুলনায় স্পোর্টস শিক্ষক সীমিত। তাছাড়া ভিলাই স্টিল নিজের থেকে কোন 'ইনস্ট্রুমেণ্ট, স্পোর্টস বিভাগকে দেয় না। পয়সার জন্য ছাত্রদের কালেকশনের ওপর নির্ভর করতে হয়। জিমন্যাস্টিক্সের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বক্তব্য অনুযায়ী 'বোল্টিং বক্স, আউর প্যারালাল বারকে লিয়ে হাজার রূপয়া হমনে কলেক্ট কিয়া থা ; লেকিন পতা নেহী সামান কব আয়েগা।'

স্কুল ম্যানেজমেণ্ট তথা সারা ভিলাই স্টিলের মধ্যে এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি কোন ব্যবস্থা না করা বা একটা আচ্ছন্ন গড়িমসি ভাব আছে এটা অনেকেই অভিযোগ করেন। ওদের বিশ্বাস—'অগর সহী পরিমান মৌকা আউর পৈসা মিলে তো হমনে ভি কুছ করকে দিখায়েংগে।' ●

ছাত্র-ছাত্রীদের ডাইভের কৌশল শেখাচ্ছেন শ্রীকর। নিচে স্প্রিং বোর্ড।



সুধীর ফাড়কে সব ম্যাচ জিতল

বাঙ্গালোর থেকে আর অরবিন্দম ঃ অকস্মাৎ ঢেঁকি কর্ণাটক রাজ্য টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন লজ্জার মাথা খেয়েছে। তা না হলে সেখানকার প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি 'আয়োডেক্স সুপার' টেবল টেনিস টুর্নামেন্টের যে আয়োজন করেছিল তাতে ওদের একজন কর্মকর্তাকেও হাজির হতে দেখা গেল না কেন? আসলে ওরা নিজেরাও কিছু করবেন না, অন্যদেরও করতে দেবেন না।

অথচ এই টুর্নামেন্টে দেশের প্রায় সমস্ত বড় খেলোয়াড়ই খেলেছে। কর্ণাটকের বুভুক্ষু টেবল টেনিস রসিকেরা প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। হলের আসন খালি পড়ে থাকেনি।

টুর্নামেন্টে দর্শকদের অভিনন্দন কুড়িয়েছে সব থেকে বেশী তিনজন—তিনজনই তরুণ এবং উঠতি খেলোয়াড়। এদের প্রথম জন মহারাষ্ট্রের এস রামস্বামী—এবারের টুর্নামেন্টে সে-ই হয়েছে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। দ্বিতীয় জন দিল্লির মনমিৎ সিং ও তামিলনাড়ুর রামচন্দ্র হরি তৃতীয়।



এরা প্রত্যেকেই ক্রীড়া চাতুর্যে দর্শকদের মাত করে দিয়েছে। তবে বিশপ কটন মিলস গার্লস হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামে এই চার দিনের টুর্নামেন্টে হরির সাফল্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে হরি তার তিনটি ম্যাচই জিতেছে এবং তামিলনাড়ুকে জয় এনে দিয়েছে। ওই তিনটি জয়ের মধ্যে একটি জয় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মনজিৎ দুয়ার বিরুদ্ধে।

শেষদিনে ফাইনাল ছিল চরম উত্তেজনা-পূর্ণ। মহারাষ্ট্র বনাম দিল্লির এই ফাইনালে নবম গেমে রামস্বামী একদিকে, মনমিৎ সিং অন্যপ্রান্তে। ফলাফল তখন ৪-৪। এটা ছিল সেদিন রামস্বামীর দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে সে হারিয়েছে মনজিৎ দুয়াকে।

নিজের জয় আর সঙ্গে সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে নেবার জন্য দুই তরুণই চোয়াল শক্ত করে লড়াই চালাল। এক একটি মার যেন এক একটি বুলেট। শেষ পর্যন্ত রামস্বামী জিতল, আর তার দল মহারাষ্ট্র পেল চার হাজার টাকা। রামস্বামীর জয় অবশ্য সামান্য ব্যবধানে (১৮-২১, ২১-১৯, ২২-২০)। দিল্লি পেল ২ হাজার টাকা।

জয়ের পর আকাশে দু'হাত তুলে রামস্বামী আনন্দে বিহ্বল হলেও মনমিতের মুখে কোন পরিবর্তনই দেখা যায়নি। দিল্লি ৪-৫ ব্যবধানে হারলেও দীর্ঘদেহী সুধীর ফাড়কে তার সুনাম বজায় রেখেছে ফাইনালের তিনটি ম্যাচই জিতে। অবশ্য তার সতীর্থ মনজিৎ দুয়া নিশ্চিতভাবেই নিজের খেলোয়াড় জীবন থেকে এই টুর্নামেন্টের তিক্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে চাইবে। কারণ, এই প্রথম বোধহয় সে হারের পর হারের মুখ দেখল।

কর্ণাটক এই টুর্নামেন্টে অবিশ্বাস্য রকম ভাল খেলেছে তাদের চৌকস খেলোয়াড় অরুণ-কুমারের জন্য। চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্রের হাতে তারা হেরেছে ৫-৩ ব্যবধানে—তিনটি ম্যাচই জিতেছে অরুণকুমার।

রাজ্য টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের অসহযোগিতা সত্ত্বেও তথ্য ও যুব কল্যাণমন্ত্রী শ্রীনিবাসের বিশেষ সহযোগিতা ধন্য প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন টুর্নামেন্টকে সাফল্যের এভারেস্টে নিয়ে গেছে। দেখা যাক, এরপরও রাজ্য টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ঘুমড় ভাঙে কিনা।

সব খেলার সেরা—

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

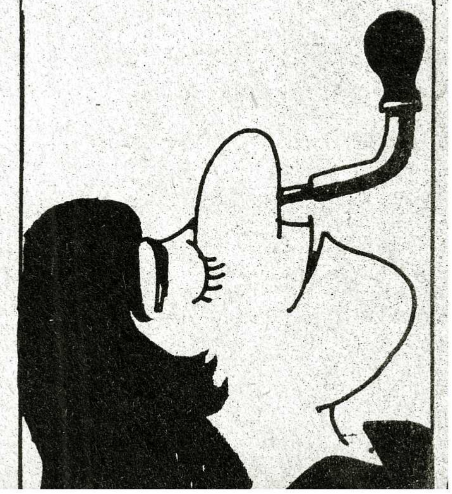


আতা-গাছে তোতা-পাখী
ডালিম-গাছে বেল!
'আই-এফ্-এ'র লিগ-শিল্ডের
জম্‌জমাটি 'খেল্' !!

লিগের ওঠা-নামার খেলায়
কেউ পাশ, কেউ ফেল্!
কেউ কাঁদে, কেউ ঘুমোয় নাকে
দিয়ে সরষের তেল !!

খেলার শেষে রাস্তা-ঘাটে
সেকি ভিড়ের ঠেল্!
থম্‌কে দাঁড়ায় ট্যাক্সি-মিনি
ডবল্-ডেকার-'এল্' !!

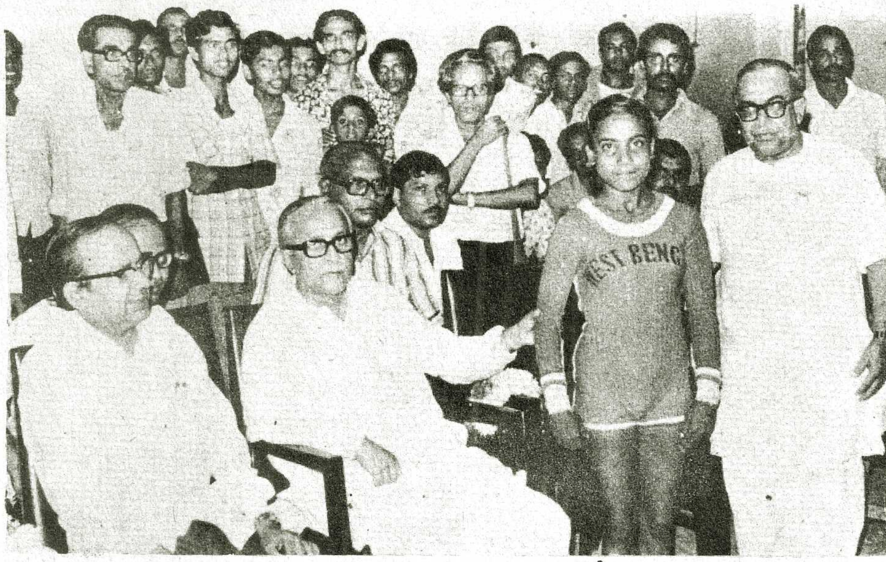
মাঝে-মাঝেই গণ্ডগোলে
পটকা-বোমার 'খেল্'!
ইঁট-পাটকেল, ঘোড়া পুলিশ
টিয়ার-গ্যাসের 'শেল্' !!



কলকাতায় রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স নজর কাড়তে পারেনি ঃ চোখে পড়ল নানা ত্রুটি

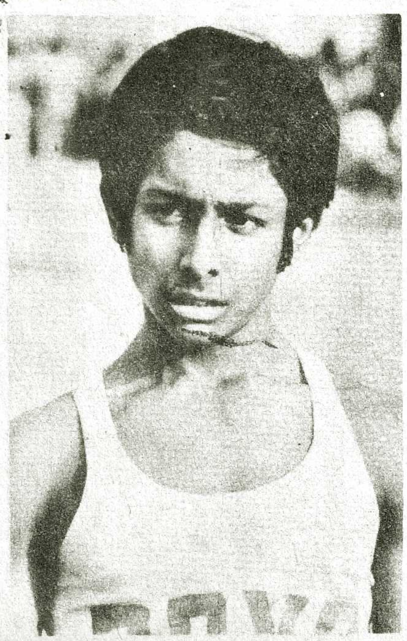
স্টাফ রিপোর্টার ঃ গ্রামাঞ্চলে খেলাধূলা ছড়িয়ে দেবার কথা সামনে রেখে রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সংস্থা গত দু'বছরের রাজ্য প্রতিযোগিতাটিকে শহর কলকাতা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। ফলও পাওয়া গিয়েছিল আশানুরূপ। গত বছর রাণাঘাটে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার পর শোনা গিয়েছিল এবারের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের দায়িত্ব পাবে মেদিনীপুর জেলা জিমন্যাস্টিক্স সংস্থা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরনো ট্র্যাডিশন অনুযায়ী এবছর রাজ্য সংস্থার পরিচালনায় রাজ্য প্রতিযোগিতার তেত্রিশতম আসরটি বসেছিল কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ৩০ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর। তিনদিন মেয়াদী এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা অন্যান্য বারের তুলনায় এবছর অনেক ভাল পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় ভাল ইনস্ট্রুমেন্টে তাদের কারিগরি দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ দারুণভাবে সাহায্য করেছেন মেয়েদের সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে। ছেলেদের সমস্ত সরঞ্জামগুলি ছিল বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির। এত সব সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের অগোছালো ব্যবস্থাপনায় রাজ্য প্রতিযোগিতাটি কোন সময়েই স্বাভাবিকভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত গতিময় হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথমত রাজ্য সংস্থা কলকাতার বাইরে থেকে আসা প্রতিযোগীদের থাকা বা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করেননি। প্রথম দিন কর্তৃপক্ষের দেওয়া সামান্য টিফিন খেয়েই বাইরের ছেলেমেয়েরা কম্পিটিশনে নেমেছে।

তাছাড়া কলকাতায় অনেকেই নতুন এসেছে। তার ওপর কাছেপিঠে কোন হোটেলও নেই। যার ফলে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েদের এই তিনদিন খাওয়া-দাওয়া জোটেনি ভালমত। প্রথমদিন স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের মত কাছাকাছি মফস্বলের ছেলে-মেয়েরাও বাড়ি ফিরে গেছে রাত ন'টার পর কম্পিটিশন শেষ করে। যাদের যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাদের রাত কাটাতে হয়েছে ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারির নীচের ঘরে। সেখানে ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে মশার কামড়ে কারও পক্ষেই ঘুমনো সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত জাজদের পক্ষপাতিত্বকে ঘিরে দৃষ্টিকটু ঘটনার অবতারণাও প্রায়শই ঘটেছে। এমনকি জাজদের খোলা গলায় চিৎকারে প্রতিযোগীদের দারুণ অসুবিধাই হয়েছে। আবার এমনও দেখা গেছে প্রতিযোগীদের ওয়ার্ম আপ করা শেষ, অথচ জাজদের দেখা নেই।



রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সের প্রথম দিনে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে অঞ্জুরাণী দে/পাহাড়ী

বিশেষ কিছু ইভেন্টে এমন কয়েকজন জাজকে বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাদের কাছে সঠিক রায় পাওয়া যায়নি বলে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সবচেয়ে বেশী নজর কেড়েছে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকে পড়া বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী। যারা কম বয়সের সার্টিফিকেট দেখিয়ে অনায়াসেই অপেক্ষাকৃত কমবয়সীদের সঙ্গে একই ইভেন্টে দাপটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা দরকার—প্রতিযোগীরা যদি তাদের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে না পারে, সেক্ষেত্রে বয়স-সীমা বেঁধে দিয়ে লোক হাসাবার পিছনে যুক্তি কোথায়? যেখানে বয়সের সার্টিফিকেট চরম ছাড়পত্র হিসেবে গণ্য হয়।



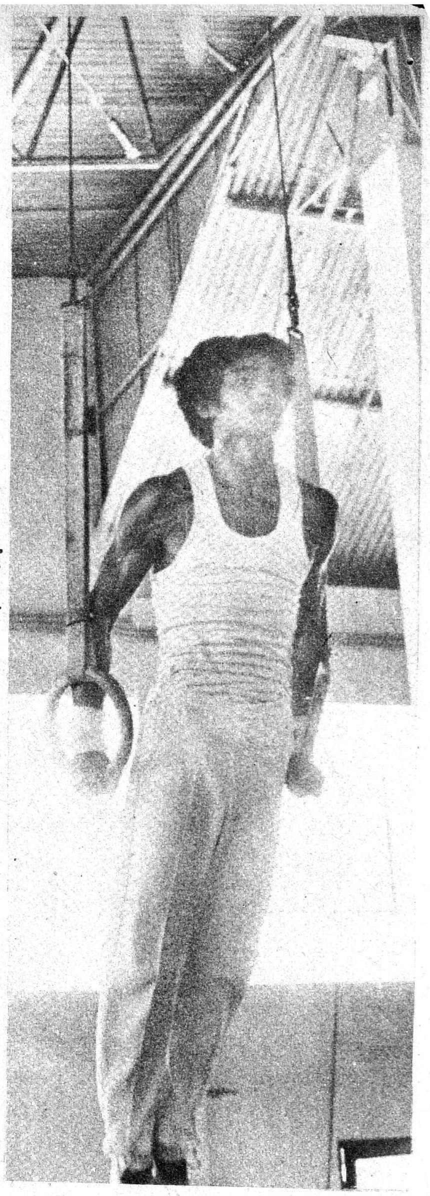
রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন (১৮ বছর) অঞ্জন দাস/পাহাড়ী

সবচেয়ে বড় কথা—এই বয়স ভাঁড়ানোর হিড়িকে নতুন মুখের দেখা মেলা ক্রমশঃই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এই কচিকাঁচা ট্যালেন্টদের এই দুর্নীতির পাঁক থেকে রক্ষা না করতে পারলে আগামীতে জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সের আসরে বাংলার অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখা মুস্কিল হয়ে পড়বে।

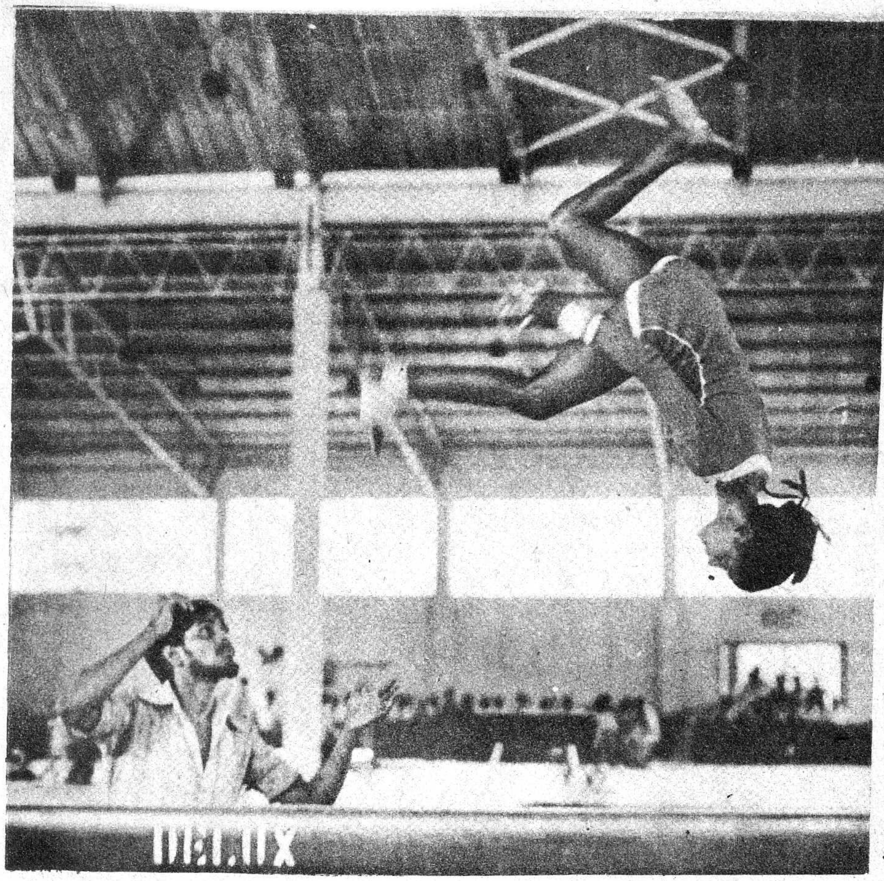
মনে হয় এই সমস্ত সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই বাংলার জিমন্যাস্টিক্স দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারছে না।

এবছরের প্রতিযোগিতায় ১৪ বছর মেয়েদের বিভাগে অঞ্জুরাণী দে (মহাবীর ব্যায়াম সমিতি) এবং ১৮ বছর ছেলেদের গ্রুপে অঞ্জন দাস (বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি) বেশ কিছু নতুন ফিগার দেখিয়ে সকলকে আনন্দ দিয়েছে। বিশেষ করে অঞ্জু এমন দু-একটি খেলা দেখিয়েছে যা ভারতে এর আগে কোন মেয়ে করেনি। ভল্টিং হর্সে 'সুখাহারা' এবং বিমের ওপর নিখুঁত সামার সল্ট দিয়েছে অঞ্জু। তবে গতবারের রেকর্ড-সংখ্যক প্রতিযোগীর (প্রায় চারশো) পাশাপাশি এবারের ২৮০ জনের যোগদানের ব্যাপারটা চিন্তার বিষয়।

প্রথমদিন সন্ধ্যেবেলা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী স্টেডিয়ামে হাজির থেকে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেন। এছাড়া শেষ দিনে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের পক্ষ থেকে ১৯৬২-এর জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়ন-শিপের একটি ফিল্ম ছেলেমেয়েদের দেখানো হয়েছে। এছাড়াও স্পোর্টস কাউন্সিলের তরফ থেকে উদ্যোক্তারা পাঁচ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছেন।



রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন (২০ বছর) উত্তম কাঞ্জি/পাহাড়ী



রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন (১৪ বছর) অঞ্জুরাণী দে/পাহাড়ী

সবশেষে একটি খুশীর কথা জানাই। গত বছর জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সে ভাল ফল করার নিরিখে বিভিন্ন বিভাগে বাংলার ১০জন ছেলে-মেয়ে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান ইয়ুথ জিমন্যাস্টিক্সে ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে। পাতিয়ালায় এই ক্যাম্পটির মেয়াদ এক মাস। ভারতী ঘোষ, শিখা বড়ুয়া, অঞ্জুরাণী দে, রূপালী দে দালাল, চন্দনা চক্রবর্তী, অঞ্জন দাস, মণিকান্ত শর্মা, স্বপন বড়াল, উত্তম কাঞ্জি ও গৌতম দাস পাতিয়ালায় চলে গেছে।

একনজরে বিভিন্ন বিভাগের ফল

১৪ বছর

ছেলে—ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—অনিমেষ দাস (হুগলী)।

দলগত চ্যাম্পিয়ন—হুগলী।

মেয়ে—ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—অঞ্জুরাণী দে (মহাবীর ব্যায়াম সমিতি)।

দলগত চ্যাম্পিয়ন—বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি।

১৮ বছর

ছেলে—ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—অঞ্জন দাস (বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি)।

দলগত চ্যাম্পিয়ন—মহাবীর ব্যায়াম সমিতি।

মেয়ে—ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—মিতালী স্বর্ণকার (বর্ধমান)।

দলগত চ্যাম্পিয়ন—বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি।

২০ বছর

ছেলে—ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—উত্তম কাঞ্জি (বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি)।

দলগত চ্যাম্পিয়ন—হুগলী।

মেয়ে—ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—শম্পা মুখার্জি (মহাবীর ব্যায়াম সমিতি)।

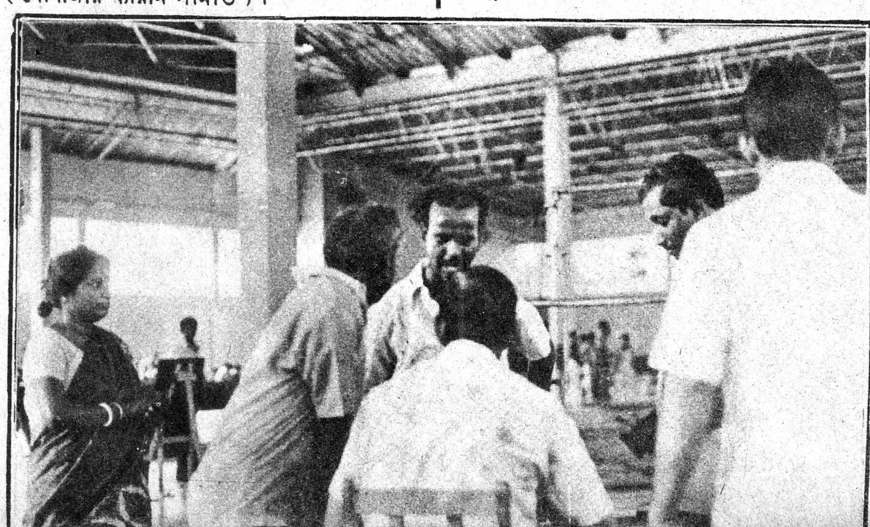
দলগত চ্যাম্পিয়ন—বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি।

মহিলা বিভাগ

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—কৃষ্ণা মালি (মহাবীর ব্যায়াম সমিতি)।

পুরুষ বিভাগ

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—তারাপদ মুখার্জি (হুগলী)।





ঢালগঞ্জ গোলমুখে হরজিন্দর/অরুণ মুখার্জি



খেলার আগে দক্ষিণ কোরিয়া দল (১১।৯)/শংকর

মোহনবাগান ঃ মহমেডান—শ্যামের দেওয়া প্রথম গোল/পাহাড়ী



মোহনবাগান ঃ মহমেডান—বলের দখল নিতে মানসকে কি গৌরাঙ্গ সাহায্য করছে ?/পাহাড়ী



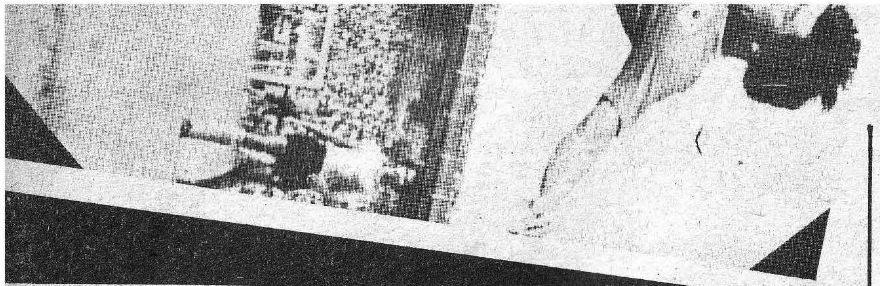
বি এন আর ঃ মহমেডান স্পোর্টিং বাঁদিকে নাজিব, ডানদিকে অমলরাজ মাঝে বিপ্লব মজুমদার /অরু

আই এফ এ শীল্ড '৭৯



দক্ষিণ কোরিয়া ঃ ইস্টবেঙ্গল—ইস্টবেঙ্গল গোলমুখে/শংকর



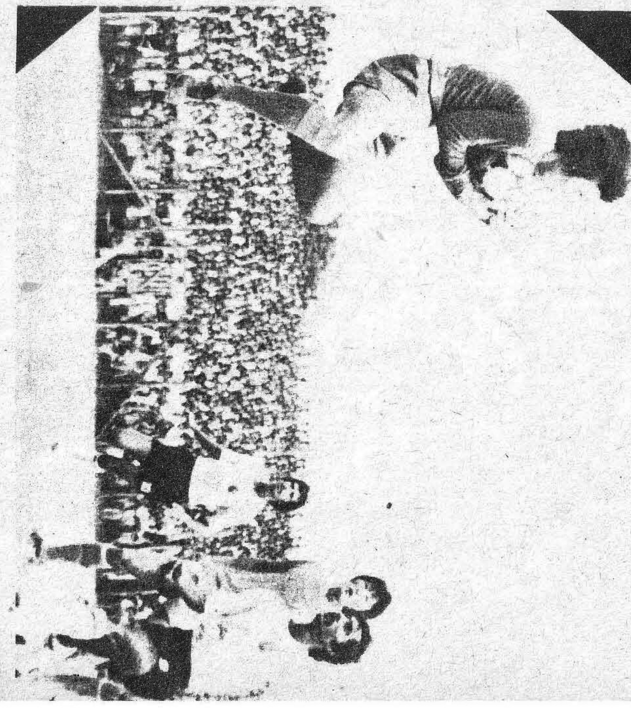


দক্ষিণ কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করছে এরিয়ানের গোলরক্ষক জগদীশ/পাহাড়ী





দক্ষিণ কোরিয়ার গোলরক্ষক এরিয়ানের
আক্রমণের মোকাবেলা করছে/শংকর



মানস কি গোল করবে ? মহমেডান স্পোর্টিং-
এর গৌরাঙ্গ ও অশোক উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ্য করছে/পাঃ



শিশুবর্ষে হাবড়ায় শিশু ক্রীড়া উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক হাজার শিশুর সমাবেশ ঘটেছিল চব্বিশ পরগণা জেলার হাটথুবা গ্রামে, উপলক্ষ্য আন্তর্জাতিক শিশু-বর্ষে শিশু ক্রীড়া। উদ্যোক্তা হাবড়া শিশু উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি। ১৯ থেকে ২৬ আগস্ট আটদিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসরে শুধু চব্বিশ পরগণা জেলার ছেলে-মেয়েরাই অংশ নেয়নি। হাওড়া, হুগলী ও নদীয়া জেলা থেকে বহু ক্ষুদে খেলোয়াড়ের ভীড় হয়েছিল প্রতিযোগিতাগুলিকে কেন্দ্র করে। সেজন্য এই কয়দিন এই ছোট্ট জায়গাটুকু হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। গ্রামের বিভিন্ন মাঠে প্রতিদিন দর্শক উপছে পড়েছে ক্ষুদে খেলোয়াড়দের খেলা উপভোগ করার জন্য। তারা বাহবা জানিয়েছেন প্রতিটি খেলোয়াড়ের উন্নত মানের ক্রীড়াশৈলীকে।

প্রতিযোগিতা চলেছে অ্যাথলেটিক্স, খো-খো, কবাডি ও ফুটবল। প্রতিটি বিষয়ে বালক ও বালিকাদের আলাদা বিভাগ ছিল। সমস্ত খেলোয়াড়দের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও ছিল নিখুঁত। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে স্বপন দে জানালেন, প্রতিযোগিতার দরুণ সরকার থেকে কোন সাহায্য তারা পাননি। সমস্ত হাবড়াবাসী উৎসবকে সার্থক করতে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছেন। খো-খো প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা বিভাগের অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল : কাকপুল সূর্য-শিখা মণিমেলা, হুগলী প্রগতি সংঘ, বেল-ঘরিয়া সুভাষ শক্তি সংঘ, হাটথুবা অগ্রণী অভিযাত্রিক, হাবড়া কালিবালা কন্যা বিদ্যা-পীঠ, নদীয়া কাজলা রবীন্দ্র শিক্ষানিকেতন ও ইছাপুর উজ্জ্বল সংঘ। বালক বিভাগে চ্যাম্পি-য়নশিপের মর্যাদা পেল বেলঘরিয়া সুভাষ শক্তি সংঘ। তারা ফাইনালে এক ইনিংস ও এক পয়েন্টে হুগলী প্রগতি সংঘকে হারায়।

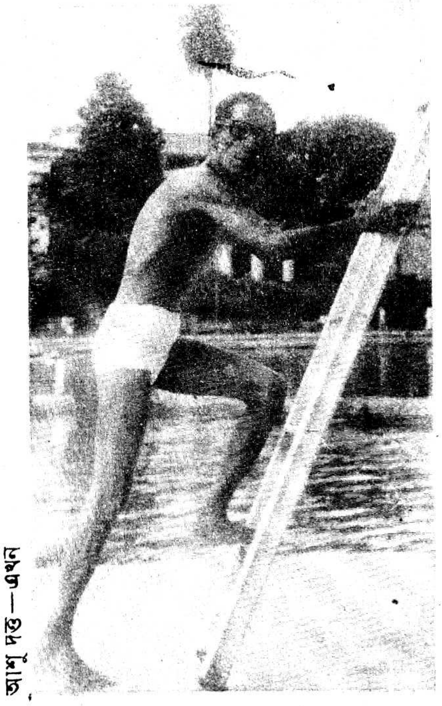
কবাডি প্রতিযোগিতায় খেলাগুলো দর্শক-দের মন কেড়েছে। বেশ কয়েকজন ক্ষুদে খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর ছিল সুস্পষ্ট। কয়েকটি আক্রমণ ছিল দেখবার মত। বালিকা বিভাগে স্বামাজী স্মৃতি সংঘের সন্ধ্যা রায়, লুনা বিশ্বাস ও ইলা পালের খেলায় জাত খেলোয়াড়ের ছাপ সুস্পষ্ট। বালক বিভাগে কয়েকটি দলের খেলোয়াড়দের বয়স আপাতঃদৃষ্টিতে বেশী বলে মনে হয়েছে। বয়স ভাঁড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোক্তারা কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সাধ্যমত তারা বেশী বয়স্ক খেলোয়াড়দের বাতিল করেছেন। হাবড়া অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষ হাতে হাত মিলিয়েছেন শিশু ক্রীড়া উৎসবকে সার্থক রূপ দান করতে। তারাই নির্ধারণ করেছেন খেলোয়াড়দের বয়সের মাপকাঠি। এ কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কবাডি প্রতি-যোগিতায় খেলেছে বনবনিয়া তরুণ সংঘ, দমদম স্বামীজি স্মৃতি সংঘ, হাবড়া অগ্রণী অভিযাত্রিক, নদীয়া রবীন্দ্র শিক্ষানিকেতন, ইছাপুর উজ্জ্বল সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। ফাইনালে খেলেছে বালিকা বিভাগে দমদম স্বামীজি স্মৃতি সংঘ ও নদীয়া রবীন্দ্র শিক্ষা-নিকেতন। অগ্রণী অভিযাত্রিক ও কাজলা রবীন্দ্র শিক্ষানিকেতন বালক বিভাগে ফাইনালে লড়েছে।

শিশু ক্রীড়ায় মূল আকর্ষণ ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে ফুটবলারদের খেলা। ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের খেলা দেখার জন্য মাঠের চারিদিকে কানায় কানায় দর্শক ঠাসা ছিল। যোগদানকারী দলগুলি : কামারথুবা ঐক্যতান, দমদম স্বামীজি স্মৃতি সংঘ, হাটথুবা উজ্জ্বল সংঘ, নদীয়া রবীন্দ্র শিক্ষানিকেতন, হাবড়া অরবিন্দ ক্লাব, অশোকনগর নবারুণ মণিমেলা, হাটথুবা অগ্রণী অভিযাত্রিক, হাবড়া অ্যাথলেটিক্স। ফাইনাল খেলায় দমদম স্বামীজি সংঘ ২-১ গোলে হাবড়া অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল। সমস্ত খেলায় খেলোয়াড়দের বয়স সীমা বারো বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। হাবড়া অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের গোলকিপারের বয়স বেশী বলে বিজয়ী দল লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সমস্ত খেলার বিজয়ী ও বিজেতা দলকে শিল্ড দেওয়া হয়েছে। মোট ছাপান্নটি ছোট বড় শিল্ড বিভিন্ন প্রতি-যোগিতার বিজেতা ও বিজয়ী দলদের দেওয়া হয়েছে বলে উৎসব কমিটির আহ্বায়ক পীযূষ কান্তি পোদ্দার জানালেন।



ফুটবল ফাইনালে দমদম স্বামীজি সংঘ ও হাবড়া অ্যাথলেটিক্স ক্লাব / পার্থ সেনগুপ্ত

এখন কি করছেন



ছবি—তপন দাস

সমীর ঘোষ : আদি বাড়ি ওপার বাংলায় হলেও জন্ম কর্ম সবই এপার বাংলায়। বছর দশ বারো বয়সে দাদার সঙ্গে এসে তখনকার সেরা ডাইভার লালবিহারী সেনের ডাইভিং দেখে নিজেরও ডাইভার হবার সাধ জাগে। সাঁতার আগেই শেখা হয়ে গিয়ে-ছিল। সুপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য তালতলা ক্লাবে নাম লেখান। শেখানোর কেউ নেই। সেজন্য এতটুকু দমে না গিয়ে নিজেই অনুকরণ করতে লাগলেন লালবিহারী সেনকে। কায়দা কানুন কিছুই জানা ছিল না, শুধু ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে এইটুকু মনে রেখে অনুশীলনে মেতে উঠেছিলেন।

লালবিহারী সেনের এক শিষ্য বৈদ্যনাথ দাসের সঙ্গে আলাপ হয় ঘটনাচক্রে, পরবর্তী-কালে আশু দত্ত তার কাছ থেকে ডাইভিং-এর প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। অবশ্য বৈদ্যনাথ-বাবুকে হাতের কাছে পাওয়া যেত না। সব কিছু হত সন্ধ্যায় মুখে মুখে। ১৯২৮ সালে তালতলা ক্লাবের সদস্য হবার পর ১৯৩১ ও ১৯৩২ এই দুই বছর ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসে জুনিয়র ডাইভিং-এ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে উভয় প্রতিযোগিতাতে দ্বিতীয় হন।

১৯৩৩ সালে বৈদ্যনাথবাবু আশু দত্তকে কলেজ স্কোয়ারে নিয়ে আসেন। তারপর থেকেই শুরু হয় ডাইভিং নিয়ে সাধনা। সিনিয়র বিভাগে কলেজ স্কোয়ার স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করেন ও ওয়াটারপোলোতেও রপ্ত

হওয়ার কাজ শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় ডাইভিং-এ দ্বিতীয় হন।

১৯৩৪ সালে বৌবাজার ক্লাবের জন্ম। সেই থেকে বৌবাজার ক্লাবের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইতিমধ্যে বার্লিনগামী ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার জন্য বার্লিনে দল পাঠানো স্থগিত রাখা হয়। বৌবাজার ক্লাবের পান্না-লাল আহির নানা বিদেশী পত্র পত্রিকা, বই প্রভৃতি আনিয়ে আশুবাবুর ডাইভিং উন্নত করার কাজে লেগে পড়েন। অপর দিকে পশুপতি চৌধুরী সাঁতারের দিকে ও গৌরহরি দাস, যামিনী দাস ও সনৎ চৌধুরী ওয়াটার-পোলোতে আশুবাবুকে নিপুণ করার ভার নেন। ১৯৩৪ সালে ডাইভিং-এ বাংলার শ্রেষ্ঠ আসনটি তার দখলে আসে। এই সময় ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান দখলে এসেছিল ১৯৩৫, ৩৯, ৪১, ৪৮, ৫০, ৫১ ও ১৯৫৯ সালে। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ স্থানটি দখল করার পর সরে আসেন।

১৯৪৮ সালে চার হাজার টাকার জন্য লণ্ডন ওলিম্পিকে যোগদান বাতিল করতে হয়। ১৯৫১ সালে দিল্লির প্রথম এশিয়ান গেমসে স্প্রিং-বোর্ড ডাইভিং-এ দ্বিতীয়। ১৯৫৪ সালে ম্যানিলায় দ্বিতীয় এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। কিন্তু বোর্ড ভেঙে পড়ে যাওয়ার দরুণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বিরত থাকতে হয়। সামার সল্টে প্রথম শিক্ষালাভ করেন প্রফুল্ল কুমার ঘোষের কাছে। সেই সময় একমাত্র প্রফুল্লবাবুই এই বিষয়ে ছিলেন দক্ষ। ১৯৩৪ সালে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসে ওয়ান অ্যাণ্ড হাফ সামার সল্টে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বিষয়ে প্রথম স্থানটি পরের বছরও তার দখলে এসেছিল।

১৯৬০ সালে অবসর নেবার পর তালিম দেওয়ার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য অবসর নেবার অনেক আগে ১৯৩৫ সাল থেকেই ডাইভার গড়ার কাজ শুরু করে-ছিলেন। সেই সময়ের কানাই ব্যানার্জি, সুভাষ দে, রঞ্জিত সিংহ ও এখনকার জাভেদ মুসা খান, সুরঞ্জন রায় চৌধুরী প্রমুখ আশুবাবুর ছাত্র। বৌবাজার ছাড়া সেণ্ট্রাল সুইমিং, পদ্মপুকুর ও ক্যালকাটা স্পোর্টস ক্লাবেও ডাইভিং শিক্ষার কাজে তিনি যুক্ত।

বীরভূমে আবার ফুটবল শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েক বছর বীরভূম জেলা ফুটবল লিগের খেলা বন্ধ ছিল। শুধু ফুটবল নয় অন্যান্য খেলারও ব্যবস্থা হয়নি। এমনকি আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতার আসরে জেলা দল যোগ দেয়নি। দীর্ঘ কয়েক বছর পর এবছর পুরুলিয়াতে আন্তঃজেলা জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় বীরভূম জেলা দল খেলেছে। বলার মত কথা আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলির গাড়ি ভাড়া, বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা উদ্যোক্তারাই করে থাকেন। এজন্য যোগদানকারী দলগুলিকে কোন খরচ বহন করতে হয় না। এসব সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন খেলার আন্তঃ-জেলা প্রতিযোগিতার আসরে বীরভূম জেলা দল যোগ দেয়নি। অথচ এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খেলাধূলার বেশ প্রচলন রয়েছে। বোলপুরে ফুটবল খেলার মত উন্নতমানের বেশ কয়েকটি মাঠও আছে। যেখানে প্রতিদিন কয়েক'শ ছেলেমেয়ে নানারকম খেলায় অংশ-গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এখানে বড় বড় কয়েকটি ফুটবল নক-আউট প্রতিযোগিতা প্রতি বছর হয়ে থাকে। কলকাতা সহ অন্যান্য বহু জেলা থেকে বিভিন্ন নামী-দামী ফুটবল দল এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট ও সিউড়িতে ফুটবল মরশুমে চলে বিভিন্ন টুর্নামেণ্ট। একথা ঠিক বীরভূম জেলার মধ্যে বোলপুর হল খেলাধূলার কেন্দ্রমণি।

বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত জেলা ফুটবল লিগে মোট আঠারটি দল এবার খেলেছে। দলগুলি: স্বামী সত্যানন্দ ক্রীড়া সংস্থা, সিউড়ি রেড রোজ, কালেক্টরেট কর্মচারী ক্রীড়া সংস্থা, কারিধ্যা মিলন সংঘ, পুলিশ অ্যাথেলেটিক্স ক্লাব, তিলপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, সিউড়ি বিবেকানন্দ সংঘ, প্লেয়ার্স কর্নার, দুবরাজপুর মাদ্রীক সংঘ, সিউড়ি উদয়ন ক্লাব, সাহাপুর যুব সংঘ, বোলপুর টাউন ক্লাব, কির্নাহার ক্রীড়া সংস্থা, বোলপুর ইয়ং টাউন ক্লাব, আহমদপুর প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, সাঁইথিয়া ক্রীড়া সংস্থা, কুরুমসাহা সানরাইজ ক্লাব ও কুচুইঘাটা নেতাজী ক্লাব।

অন্যান্য জেলায় যেমন তিনটি ডিভিসনে জেলা ফুটবল লিগের খেলা চলে এ জেলায় কিন্তু সে রকম ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আঠারটি দলকে পাঁচটি পুলে ভাগ করে লিগের খেলা চলছে। খেলাগুলি সিউড়ি, সাঁইথিয়া ও বোলপুরের বিভিন্ন মাঠে হচ্ছে। প্রত্যেক পুল থেকে সর্বোচ্চ পয়েন্ট প্রাপ্ত দলগুলিকে নিয়ে নক-আউট পদ্ধতিতে খেলা হবে। একথা জানালেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিদ্যাসাগর পাঁজা।

বিদ্যাসাগরবাবু হলেন জেলা শারীর-শিক্ষা সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, বীরভূম জেলায় সেরা মাঠের বেশ অভাব। সেজন্য লিগের খেলা চলাকালীন মাঝে মাঝে মাঠে বেশ অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। খেলা চলা-কালীন প্রায় সময়ই দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ছে। লিগের খেলা শেষ হবে কিনা এবিষয়ে তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানালেন, আমি আর পারছি না জেলার সমস্ত স্কুলের খেলাধুলার দায়িত্ব পালন করতে। অফিসে কর্মচারীর সংখ্যাও কম। কাজের চাপ বেশী।

তা সত্ত্বেও জেলা শাসকের অনুরোধে তাকে এ দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে! আশ্চর্যের বিষয় এ জেলায় রেফারি ও আম্পায়ার্স সংস্থা গড়ে উঠেনি। হয়নি কোন স্টেডিয়াম। খোলা মাঠে খেলা চালানোর জন্য প্রতিদিন পুলিশের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে। প্রশ্ন হল, জেলা ক্রীড়া উৎসাহী যুবকদের নিয়ে কিছু করা যায় না? পদের মোহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দলাদলি না করে জেলার ক্রীড়ামানকে একটু টেনে তোলার দায়িত্ব তো প্রতিটি জেলাবাসীরই।



বোলপুরে পঞ্চায়েত সমিতির নক-আউট ফুটবলের একটি মুহূর্ত। ছবি: পার্থ সারথি সেনগুপ্ত



কি করে ফুটবলার হওয়া যায়

স্বরাজ ঘোষঃ একটা প্রচলিত কথা আছে 'একজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট'। অর্থাৎ উপদেশের চেয়ে উদাহরণ ভাল। আমার লেখার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছ যে, আমি লেখাগুলো উদাহরণের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি। একাদশ সংখ্যায় লিখেছিলাম যে, অ্যাথলেটিক্স শুধু অবহেলিত নয়, বর্জিতও বটে। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি, এই কারণে যে, একদিকে আমার ধারণাটা কত সত্য ও অন্যদিকে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সুযোগ পেয়েও কিভাবে আমরা সুযোগ হারাই।

বিশ্বের সর্বকালের দূরপাল্লার শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর এমিল জেটোপেকের নাম শুনে থাকবে। তিনি ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ম্যারাথন, ১০,০০০ মিঃ ও ৫,০০০ মিঃ দৌড়ে রেকর্ড সময়ের আগেই বিজয়ী হয়ে সারা বিশ্বে চমকের সৃষ্টি করেন ও 'ম্যান অব দ্য মিট ও হিউম্যান লোকোটিভ' আখ্যা লাভ করেন। সেই বিশ্ববিখ্যাত এমিল জেটোপেক ও ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক বিজয়িনী তার পত্নী ডানা জেটোপেক ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫৩ সালে ভারত পরিদর্শনে আসেন। তাদের সফরসূচী অনুযায়ী তারা কলকাতায়ও আসেন। তখন আমাদের ভরা যৌবন ও ফুটবলে দুর্দান্ত প্রতাপ। ওইদিকে আবার অ্যাথলেটিক্স করছি। স্বভাবতই তাদের দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলাম। জেটোপেকের কর্মসূচী অনুযায়ী সিটি অ্যাথলেটিক মাঠে একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। আমিও তাতে যোগদান করি। ভেবেছিলাম, তাদের দেখবার জন্য দেশের সমস্ত লোক উঠতি অ্যাথলিট ও ফুটবল খেলোয়াড়গণের ভিড়ে মাঠ ভেঙে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যেন অবহেলিত সম্রাটের সমাদরের জন্য মুষ্টিমেয় অ্যাথলিট ও কর্মকর্তা জড় হয়েছেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেই ফেলেছিলেন, 'দেশে অ্যাথলেটিক্স-এর এই অবস্থা?' কিন্তু আমাদের পানিহাটি স্পোর্টিং তাদের অভ্যর্থনা করতে কার্পণ্য করেনি। জেটোপেক ও তার পত্নীর পদধূলিই শুধু আমরা গ্রহণ করিনি, যেমন তারা ওলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন বেশে আমাদের মাঠে প্রাণ খুলে দৌড়িয়েছেন, তেমন আবার যত্ন করে অ্যাথলেটিক্স সম্বন্ধে আমাদের নানা উপদেশও দিয়েছেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে এক অমূল্য বাণী লিখে গেছেন। সেটা আমরা আজও বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছি ও ব্যক্তিগতভাবে সেই বাণী অনুসরণ করে চলেছি। বাণীটি হল—'প্র্যাকটিস ইজ লারনিং। কম্পিটিশন ইজ একজামিনেশন'। সেই বাণীর ব্যাখ্যাও তিনি আমাদের কাছে করে গেছেন। যত শিক্ষা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সবই অনুশীলনের সময়। কিন্তু প্রতিযোগিতা হল তারই পরীক্ষা। প্রতিযোগিতার সময় কোন এক্সপেরিমেন্ট বা নিরীক্ষা চলবে না, সেটা বিজ্ঞানের বাইরে। যেটা জ্ঞান ও ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে সেটাই পূর্ণশক্তি দিয়ে প্রতিযোগিতার সময় প্রকাশ করতে হয়। আর অনুশীলনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। অধ্যাবসায়ই হল কৃতকার্যের সোপান। এই সময়টা মূল্যবান মনে করে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয়।



এখন চলছে অস্ত্রবিদ্যাপর্ব। অর্থাৎ ট্রেনিং পর্ব। প্রতিযোগিতার পর্ব হল যুদ্ধপর্বে। যুদ্ধবিদ্যাপর্বে যখন আসব তখন এই ব্যাপারে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব।

এর আগের সংখ্যায় হাইজাম্পের সঙ্গে ফুটবলের সাক্ষাৎ কোথায় তা ছবি দিয়ে প্রকাশ করেছি। এবার লিখছি হপ, স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প বিষয় নিয়ে। এই জাম্পটি খেলা পরিস্থিতি অনুযায়ী গোলকিপার থেকে আরম্ভ করে সব পজিসনের খেলোয়াড়দের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এই জাম্পটি আয়ত্ত করতে পারলে সচল ও নিশ্চল অবস্থায় গোলকিপারের 'ওভার হেড' অর্থাৎ মাথার উপর থেকে উঁচু বল হোল্ডিং বা গ্রিপিং, ফিস্ট বা পাঞ্চ করতে কোনই অসুবিধা হবে না। আবার অন্যান্য পজিসনের খেলোয়াড়দের 'স্পট হেডিং' অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থায় একই জায়গা থেকে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের মাথার ওপরে উঁচুতে লাফ দিয়ে উঠে হেডিং। আবার 'অ্যাডভান্স হেডিং' অর্থাৎ দৌড়ের ওপর উঁচুতে লাফ দিয়ে উঠে হেড করে বল ক্লিয়ার বা পাস করা যায়।

ব্রড জাম্পের ব্যাপারে 'টেক অফ্ চিহ্ন' থেকে লাফ দিতে হয়। যেটা জাম্পিং পিট অর্থাৎ যেখানে লাফ দিয়ে ল্যাণ্ড করতে হয়, সেই 'জাম্প পিট' থেকে রানওয়ের দিকে সাধারণত ১০ ফুট দূরত্বের ব্যবধান থাকে। কিন্তু হপ্, স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্পের ব্যাপারে 'টেক অফ্ চিহ্ন' থেকে ৩০-৩৫ ফুট দূরত্বের ব্যবধান থাকে। ব্রড জাম্প হল একটি সোজা লাফ। আর হপ, স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প হল একসঙ্গে তিনটি লাফ। তবে তার চরিত্র হল—'টেক অফ চিহ্ন' থেকে প্রথম লাফটিকে বলে হপ্। সেই জাম্পের সময় এমন করে জাম্প দেবে যাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাম্পের জন্য গতি থাকে। ব্রড জাম্পের মত এক লাফে শেষ হবে না। কারণ তিন লাফের দূরত্বের মাপের যোগফলই হবে হপ, স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প। কিন্তু হপ্‌টি যে পায়ে করা হয়েছে সেই পায়েই ল্যাণ্ড করতে হবে ও সেই পায়েই স্টেপ করে পা বদল করে জাম্পের জন্য জাম্প পিটের আগে মাটিতে ল্যাণ্ড করে উল্টো পায়ে জাম্প করে,



ল্যাণ্ড করার আগে সাইক্লিং করে শরীরকে টেনে তুলে দুই পা একসঙ্গে ল্যাণ্ড করতে হয়। কিন্তু ফুটবলের ব্যাপারে নন্ জাম্পিং-পা-কে স্ট্রেট ভলির মত কল্পনা করে ডামি কিক অর্থাৎ বলছাড়া কিকের মত করে ল্যাণ্ড করা অভ্যেস করতে হয়। এইভাবে এই ধরনের জাম্পটি অভ্যাস হয়ে গেলে কয়েকটি ক্ষমতা জন্মায়। সেগুলো হল—হেডিং বা গোলকিপারের পাঞ্চ করার সময় 'লিগেল পাওয়ার' বা 'লিগেল অ্যাডভান্টেজ'-এর সুযোগ নেওয়ার দৈহিক ক্ষমতা জন্মায়। সেগুলো হল জাম্পের সঙ্গে হেডিং বা পাঞ্চ করার সময় শরীরের সামনের দিকে একটা বেগ থাকে। সেই দেহের বেগটির সুযোগ নিতে হয় শরীরকে সোজা রেখে বুককে প্রাধান্য করে শক্তি ও গতির সমন্বয়ে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তা হল আইনসম্মত। তবে কাঁধ বা হাতের ডানার প্রাধান্য থাকলেই আইন বিরুদ্ধ হবে। তবে গোলকিপারের বেলায় অনেক সুযোগই দেওয়া হয়েছে। আর এই জাম্পের অনুশীলনের ফলে পায়ের কাপ পেশীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের অ্যাঙ্কেলেরও শক্তি বাড়ে। তাতে পাওয়ার কিকিং-এর ক্ষমতা বাড়ে ও কাপ পেশী খুব শক্তিশালী হয়। তাতে স্পিডেরও খুব সহায়তা করে।

প্রথম ছবিটি লক্ষ্য করবে, হপ জাম্পের পর স্টেপ করে জাম্প করছে। জাম্পাপট খুব কাছেই দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিটি ল্যাণ্ড করার আগে সাইক্লিং করে এডভান্স করছে। দ্বিতীয় ছবিটি দেখে ফুটবলার বলে নিশ্চয়ই মনে হয়।

(চলবে)

বাস্কেটবলে দল বদল করেছে ২৮ জন
লাভ হল রাখী সংঘের

স্টাফ রিপোর্টার: ১৫ থেকে ৩১ আগস্ট বাস্কেটবলের এবারের দল বদল হয়ে গেল। প্রতিদিন সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত এই দল বদল হয়েছে রাজ্য সংস্থার তাঁবুতে। খুব একটা বেশী সংখ্যায় বাস্কেটবলের দল বদল কোনবারই হয় না। এবারও হয়নি। মাত্র ২৮ জন খেলোয়াড় এবছর অন্য দলে সই করেছে।

এবারের দল বদলের পালায় সবচেয়ে লাভবান হয়েছে রাখী সংঘ। ওরা দলে পেয়েছে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট থেকে প্রতীপ তেওয়ারী ও বিতান বসুকে। প্রতীপ আগে এই দলেই খেলত। এছাড়া রাখী সংঘ দলে এনেছে হিন্দ মোটর্সের হরেরাম পাল ও আশিস বটব্যাল আর বয়েজ ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশনের সমীর দত্তকে। যদিও এবার দল থেকে পার্থ বিশ্বাস, সুবীর রায়, তাপস দত্ত, গৌতম ঘোষরা বেরিয়ে গেছে, তবুও ওদের দল ত্যাগের ক্ষতি পুষিয়ে গেছে।

সবচেয়ে লাভ যেমন করেছে রাখী সংঘ, তেমনি এবারের দল বদলে সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে হিন্দ মোটর্স দলের। কয়েকজন পুরনো খেলোয়াড় বেরিয়ে যাওয়ায় ওরা শক্তিহীন হয়েছে।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন বয়েজ ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশনের পুরনোর মধ্যে তারক সরকার, ইন্দ্রনাথ আঢ্য, গৌতম গাঙ্গুলি, অশোক গোস্বামীরা দলেই থেকে গেছে। এছাড়া ওরা তুলেছে রাখী সংঘ থেকে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পার্থ বিশ্বাসকে। তবে গতবারের জাতীয় বাস্কেটবলে বাংলার প্রতিনিধিত্বকারী সৌমেন দাস এবং অভিজ্ঞ সুকুমার চ্যাটার্জি দল ছেড়েছে এবার। সৌমেন গেছে ওয়াই এম সি এ-তে, সুকুমার পুলিশ এ সি-তে।

গত বছরের রানার্স বড় বাজার যুবক সভার টিম একই আছে। চন্দন ভট্টাচার্য, সুবীর রক্ষিত, অরুণ কেজুরিওয়াল রা এবারও একই দলের হয়ে মাঠে নামছে।

ওয়াই এম সি এ দলের শক্তিরও তেমন কোন হেরফের এ বছর ঘটেনি। পুরনো নামীদের মধ্যে দীপক মজুমদার, ম্যাথু ভার্গিস, রাজু জ্যাকব, এন সি আলুওয়ালিরা দলেই রয়ে গেছে। তার ওপর নতুনদের মধ্যে ওরা ঘরে এনেছে গৌতম ঘোষ ও সৌমেন দাসকে। লিগে ওয়াই এম সি এ-র গতবার স্থান ছিল চতুর্থ।

ছাত্র সমিতি পেয়েছে রাখী সংঘের তাপস দত্তকে। এছাড়া পুরনোদের মধ্যে নিতাই ব্যানার্জি, অলোক মল্লিক, সুশান্ত আঢ্য পুরনো ঘর ছাড়েনি। ওরা সবাই জুনিয়র এবং ভালো খেলেছে গতবার। বাস্কেটবলের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, যথা—লিগ, নকআউট, বালক ও বালিকা বিভাগ, আন্তঃঅফিস ও মিনি লিগ, ইণ্টার স্কুল সব মিলিয়ে খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক হবে। বাস্কেটবলের আগামী সিজন শুরু হবে নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ। মেয়েদের খেলা অবশ্য শুরু হয়ে গেছে।

শারীরিক দক্ষতা আসে দুই ধরনের স্কিলে

সুজিত সিংহ : অ্যাথলেটিক্সে ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ডে যা কিছু পারদর্শিতা দেখানো হয়, যেমন দৌড়, লাফ বা নিক্ষেপ—এই সবই একটি মানুষের শারীরিক চূড়ান্ত গতিময় অভিব্যক্তি। দেখা যাচ্ছে অনেক বছর ধরে মানুষের এই যে গতিময় অভিব্যক্তি বিভিন্ন কল্পনা ও আগ্রহ দ্বারাই পরিচালিত হত। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার তিনশ বছর আগে দার্শনিক এ্যারিস্টটল—যিনি এই খেলাধূলার জগতে বৈজ্ঞানিক ধারণা-যুক্ত অনেক কিছুর আনুসাঙ্গিক মত প্রচলন করেছিলেন—তার অনেক কিছুই বিজ্ঞান শিক্ষকেরা গ্রহণ করে আধুনিক খেলাধূলা যা মানুষের হিউম্যান মোশানকে গতিময় করতে সাহায্য করছে যেমন—কিংসওলজি (kingsiology), বায়-মেকানিক্স (Bio-mechanics), ফিজিওলজি (physiology), টারমিনোলজি (terminology) ইত্যাদি। এইসব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দ্বারা একজন খেলোয়াড়ের অনুশীলনে শারীরিক দক্ষতার একটি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করছে এবং তার খেলাধূলার আগ্রহকে দৃঢ় করছে। এই দক্ষতা দুই ধরনের যথা—টেকনিক স্কিল (technic skill) এবং পারসেপচুয়াল স্কিল (perceptual skill)।

টেকনিক স্কিল সাধারণত ট্র্যাক ইভেণ্টে এই অ্যাথলিটের নিজস্ব মোটর অ্যাকশান (Motor action)-এর উপর প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পারসেপচুয়াল স্কিলে আমরা দেখি পারিপার্শিক সহযোগিতা প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন দলগত খেলা (ফুটবল, হকি, ক্রিকেট)। অতএব দেখা যায় ট্র্যাক-ফিল্ড-এ একজন খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল ফল করতে হলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য নেওয়া। যা তাকে আরও গতিময় করে তুলবে। এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক প্রণালী একজন ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড-এর অ্যাথলিটকে উচ্চতর দক্ষতায় পৌঁছে দেয়। এই শিক্ষণীয় বস্তুগুলি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। নিম্নলিখিত শিক্ষার ধারাগুলি যদি ঠিকমত অ্যাথলিটরা আয়ত্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে, তবে তারা খুবই উপকৃত হবে। এই শিক্ষা একজন অ্যাথলিটকে দুই ভাবে প্রভাবিত করে। যেমন দক্ষতা শিখতে গেলে তার একটা নিজস্ব প্রণালী আছে—সব দক্ষতাই সকল বয়সে আয়ত্ত করা যায় না।

১) 'ট্রায়াল এ্যাণ্ড এরার শিক্ষা'—

অল্প বয়সের শিক্ষার্থীদের যখন দক্ষতার জিনিস শেখানো হয়—তখন দেখা যায় অনেকেই ভুল ত্রুটির মধ্য দিয়ে অভ্যাস করতে করতে কিছুটা আয়ত্ত করে নেয়, এই প্রথাকে ট্রায়াল এ্যাণ্ড এরার বলে। এরই মাধ্যমে শিক্ষকেরা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর গুণের দিকে নজর দিয়ে তাদের আরও দক্ষ করে তোলেন।

২) অনুভূতি শিক্ষা—

ট্রায়াল এ্যাণ্ড এরারে কাজ করতে করতে এক সময় তাদের হঠাৎ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞান এসে যায়, তখন দক্ষতার কয়েকটা সূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে একটা জ্ঞান লাভ করে। এই যে জ্ঞান লাভের অনুভূতিই তাদের শারীরিক ও মানসিক সামঞ্জস্য এনে দেয়, তার ফলে তারা নিজেদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

৩) কনডিশানিং শিক্ষা—

এই 'ট্রায়াল এ্যাণ্ড এরার' ১০/১২ বছরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকে। তারপরে তাদের শিক্ষকেরা বিভিন্ন কনডিশানিং-এর দ্বারা যেমন ক্রশ কাণ্ট্রি, আইসোমেট্রিক, আইসোটনিক, ফার্টলেক প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে তাদের মানসিক ও শারীরিক পটুতার একটা সমতা এনে দেন। এইসব

শিক্ষার্থী আরও দক্ষতার দিকে এগিয়ে যায় যখন, তখন শিক্ষকেরা আরও উচ্চ ধরনের শিক্ষা দিতে থাকেন। এতদিন শিক্ষকেরা দলগত ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। সেটাকে 'টিচিং' অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। তারপর যখন তাদের নিজস্ব দক্ষতা এসে যায় তখন তাদের কোচিং-এর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া। সাধারণত মনে হয় টিচিং ও কোচিং একই জিনিস কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

এইসব অনেকগুলি শিক্ষার নিয়ম আছে যা একজন ক্রীড়াবিদকে দক্ষ অ্যাথলিট-এ পরিণত করতে পারে।

৪) অনুশীলনের নিয়ম—

একটা দক্ষতায় আসতে গেলে অনেকবার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। এই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে চূড়ান্ত দক্ষতায় উন্নীত হওয়া যায়। সাধারণত শিক্ষকেরা এই অনুশীলনের প্রতি নজর রাখেন—কতখানি দক্ষতা অ্যাথলিটরা এর ফলে লাভ করেছে। শিক্ষানবীশেরা সাধারণ ভাবে অনুশীলন করতে থাকে কিন্তু বিশেষ কোন দক্ষতা অর্জন করতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে হয়—এই জন্যই শিক্ষকের দরকার।

৫) পুনঃ সংগঠনের নিয়ম—

দক্ষতার সঙ্গে অনুশীলন করতে পারে এই শিক্ষার্থীরা—সাধারণের চাইতে একটু উঁচু স্তরের। এই অনুশীলনের ধারার মধ্যেও অনেক ভাগ আছে—কতক্ষণ, কতবার, কিভাবে অনুশীলন করবে তা শিক্ষকেরাই নির্দেশ দেন শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক অবস্থা বুঝে। একেই ইংরেজীতে 'লজ্ অফ ফ্রিকোয়েন্সি (Laws of freequency) বলে।

৬) সাম্প্রতিক নিয়ম—

যে কোন দক্ষতায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার সঠিক নিয়ম মনে রাখার উপায় এই সাম্প্রতিক নিয়ম বা লজ অফ ফ্রিকোয়েন্সি। প্রতিদিন অনুশীলনের আগে, প্রতিযোগিতার আগে গা গরম করার সময় বা অনুশীলনের শেষে গা ঠাণ্ডা করার সময় এই সঠিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করতে হবে, তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৭) বিস্মৃতি হবার নিয়ম—

দেখা যায় অনুশীলনের সময় সাধারণত অনেক ভুলত্রুটি হয় কদিন অনুশীলন বন্ধ রাখলে সে ভুলত্রুটি সহজে ভোলা যায়। আবার এই অনুশীলনে বন্ধ রাখার অনেক নিয়ম আছে—যার কম বেশীর উপর ফল খারাপ বা ভাল নির্ভর করে

৮) ফলের নিয়ম—

ঠিকভাবে যদি দক্ষতা শিখতে পারে। তবে একজন অ্যাথলিট নিজ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে পারদর্শী ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেমন, ছোট ছেলেরা সাধারণ একটা স্পোর্টস-এ জয়ী হয়ে প্রাইজ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়াই বড় কথা নয়। তারা কতটা দক্ষতাপূর্ণভাবে তাদের খেলা শেষ করতে পারল সেটা শিক্ষানবীশদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়াই শিক্ষকদের কাজ। যেমন—কতটা কম সময়ে তারা দৌড়াতে পারল বা কতটা দূরত্বে তারা নিক্ষেপ করল সে সম্পর্কে শিক্ষানবীশদের জ্ঞান লাভ করানোই 'ল অফ এফেক্ট (law of effect)।

৯) মানসিক প্রস্তুতির শিক্ষা—

এটা কিছুটা যোগাসনের প্রাণায়ামের মত। খেলোয়াড়রা চুপ করে বসে খালি ভাববে সঠিক দক্ষতার উপায়গুলো। যেমন খেলোয়াড়রা বার বার চেষ্টা করে যে কোন বিষয়ে, যেমন—উচ্চলম্ফনের কোন স্টাইল বা সট-পাটের গ্লাইড বা ডিসকাসের রোটেশান প্রভৃতি ঠিকভাবে কার্যকারিতায় সক্ষম হবার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় ঠিক পূর্ণদক্ষতায় উপনীত হতে পারছে না। তখন তাকে ওই কাজ থেকে বিরত করে ৯০ সেকেণ্ড থেকে ১২০ সেকেণ্ড চোখ বন্ধ করে বসে বা শুয়ে সঠিক উপায়গুলো যদি ভাবতে আরম্ভ করানো হয়, তখন ব্রেনের (brain) উপর একটা প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে আবার যখন কিছুক্ষণ পরে খেলার অনুশীলন করতে যায় তখন দেখা যায় ভুলের মাত্রা অনেক কমে গেছে।

এখন উন্নত দেশগুলির চিন্তাধারার বক্তব্য ঃ খেলাধূলার উন্নতি কেবলমাত্র ওয়ার্ক-লোড মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না—তারা মানসিক চিন্তাধারাকে এখন আধুনিক খেলাধূলায় প্রস্তুতি শিক্ষার বিভিন্নরূপে বাস্তবে খেলোয়াড়দের সাহায্য করছে এবং করবে। খুব সহজেই বিরাট বিরাট সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। এই মনোবিজ্ঞান মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন প্রণালী পরে বলবার চেষ্টা করব। ●

উত্তর আমেরিকার দল বদলে 'বার্টার' পদ্ধতি চলছে

উত্তর আমেরিকাতে ফুটবলে দলবদল ব্যাপারটি খুবই মজার। এখানে দলবদলে খেলোয়াড়রা জড়িত থাকে না, ক্লাবগুলিই এ ব্যাপারে হর্তাকর্তা-বিধাতা। ইউরোপ বা অন্যত্র প্লেয়ারদের টাকা দিয়ে কেনা হয়। কিন্তু কানাডা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ক্লাব অপর ক্লাবের কাছে একজনের বদলে একজন কখনো কখনও দু'জন খেলোয়াড় পাল্টাপাল্টি হয়। আশ্চর্য হলেও সত্যি, সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় আগেভাগে কিছুই জানতে পারে না।

সম্প্রতি 'নিউ ইয়র্ক কসমস' গোলকিপার জ্যাক রাণ্ডকে দিয়ে 'তুলসা রামানেজ' দলের ফুলব্যাক গ্রেগ রিয়ানকে নিয়েছে। এখন রাণ্ড কিছুতেই তুলসা দলে যেতে চাইছে না। অপরদিকে ফ্রান্সিস্কো মারিনহোকে হটিয়ে সম্ভাবনাময় রিয়ান কি নিয়মিত খেলার সুযোগ পাবে ?

মফঃস্বল সংবাদ

মুর্শিদাবাদে

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ স্পোর্টিং ইউনিয়ন পরিচালিত অরুণ ভট্টাচার্য স্মৃতি শিল্ড ও গীতারানী স্মৃতি কাপ একদিনের ফুটবল হয়ে গেল। স্থানীয় আস্তাবল মাঠে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুর্শিদাবাদ টাউন ক্লাব ('বি' দল) ১—০ গোলে রতনপুর 'পঞ্চপাণ্ডব' দলকে পিছনে ফেলে শিল্ড পায়। বিজয়ী ও বিজিত দলের দুই খেলোয়াড় মানব সিনহা এবং গোলাম মহিনকে ম্যান অব দি ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়। 'ফাইভ'-এ সাইড এই প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ১৬টি দল অংশ নিয়েছিল।

★

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে মুর্শিদাবাদবাসীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে 'নন্দ স্মৃতি' আণ্ডার হাইট ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। স্থানীয় বান্ধব সমিতি পরিচালিত এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলায় নশিপুর মিলনী ৩—১ গোলে মুক্তি সংঘকে হারিয়ে ট্রফি পায়। বিজিত দলের ক্ষুদে ডিফেণ্ডার স্বরূপ কৃষ্ণ তরফদার (৮) 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচে'র পুরস্কার পেয়েছে। এক সপ্তাহ মেয়াদী এই নাইন-এ সাইড টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল যোগ দিয়েছিল।

মেদিনীপুরের সেরা ক্রিকেটার স্বপন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না

অমল ত্রিবেদী ঃ স্বপন দত্ত মেদিনী-পুরের ছেলে। নির্মল হৃদয় আশ্রমের ক্লাস এইটের ছাত্র। বয়স মাত্র চোদ্দ বছর হলে কি হবে, ইতিমধ্যে সে জেলার সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

যেদিন মেদিনীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কে ডি পাল পুলিস লাইনে স্বপনের বাড়িতে গিয়ে বললেন, স্বপন, তুমি সি এ বি মনোনীত জেলার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছ, সেদিন অবাক বিস্ময়ে তার মুখ থেকে কোন কথা বেরোয়নি। সিনিয়র, জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র বিভাগ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্য থেকে সাব-জুনিয়র খেলোয়াড় স্বপন দত্তকে সেরা ক্রিকেটার মনোনীত করেছে সি এ বি। পুরস্কার-স্বরূপ স্বপন পেয়েছে বিরাটকায় আনন্দবাজার পত্রিকা ট্রফি ও প্রতি মাসে একশ টাকা করে এক বছর স্টাইপেণ্ড।

স্বপন মেদিনীপুরের ওয়াই এম এ দলে খেলে। ছোট থেকেই সে ক্রিকেটের প্রেমে পড়েছে। তবে ডিউস বলে খেলা শুরু করেছে গত বছরে। স্বপন উইকেট কিপার। প্রয়োজনের সময় ভাল ব্যাটিং করার সুনাম তার আছে। কোচিং নিয়েছে অমিয় দত্ত ও বারীন সিনহার কাছে। এ বছর আন্তঃ জেলা সাব-জুনিয়র ক্রিকেটের ফাইনালে চন্দননগরের বিরুদ্ধে সে ভাল কিপিং করে। মেদিনীপুর ১৫ রানে জয়ী হয়। স্বপন এখনো জুনিয়র বা সিনিয়র ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেনি।

স্বপন ভাল ফুটবল গোলকিপারও। সদ্য সমাপ্ত আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়র ফুটবলের আসরে সে মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধিত্ব করেছে। এবছর তার দল রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়।

স্বপন দত্তের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। বাবা নীহাররঞ্জন দত্ত পুলিস কনস্টেবল। পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশে থাকতেন। অনেক-গুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে নীহারবাবুর অভাবের সংসার। ছেলেদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাল খেতে দিতেও পারেন না। স্বপন বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে আনা জামা প্যান্ট, কেডস দিয়ে তার খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সবাই তাকে উৎসাহ দেয়। প্রেরণা দেয় স্কুলের মাস্টার মশাই ও সহপাঠী বন্ধুরা।



সি এ বি'র দেওয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ট্রফি নিয়ে স্বপন দত্ত
অমল ত্রিবেদী

শ্যামলা ছেলেটি খুব শান্তশিষ্ট ও বোকা বোকা। প্রিয় খেলোয়াড় গাভাসকর ও সম্বরণ ব্যানার্জি। এদের কারো খেলা সে দেখেনি। অথচ এদের নানা ছবি খাতায় আঠা দিয়ে এ'টে রেখেছে, ১৯৭৯ সালের সেরা জেলা ক্রিকেটার স্বপন দত্ত যে অনেক বড় হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে মেদিনীপুরে সাধনা করে চলেছে।

২৪ পরগণা অফিস লিগে কাঁচরাপাড়া চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চব্বিশ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত অফিস লিগের খেলা সম্প্রতি শেষ হল। সর্বাধিক পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের মর্যাদা পেল কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কসপ ক্রীড়া সংস্থা। তারা পেল পলাশ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শিল্ড। রানার্স ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ক্লাব। জেলা অফিস লিগ প্রতিযোগিতায় এবার মোট চোদ্দটি অফিস দল লড়েছে। দলগুলি ঃ টিটাগড় পেপার মিলস, শ্রীমহালক্ষ্মী রিক্রিয়েশন ক্লাব, রাইফেল ফ্যাক্টরি ক্লাব, ক্লোরাইড ইণ্ডিয়া, শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিল, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপ, ৭৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, মেটাল স্টিল ফ্যাক্টরি, হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স, টেক্সম্যাকো, ডি সি রিক্রিয়েশন ক্লাব, সেন্ট্রাল ওয়ার্কসপ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও কামারহাটি জুট মিল।

জেলা অফিস লিগ জেলার খেলোয়াড়দের বড় আকর্ষণ। কারণ জেলার ভাল ভাল খেলোয়াড় এই সমস্ত অফিসে খেলোয়াড় হিসাবে চাকুরি পেয়েছেন। এই লিগ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে জেলায় চলছে। এর দরুন জেলার বিভিন্ন ডিভিসনের অনেক তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের প্রতি নজর পড়েছে এই সমস্ত অফিস ফুটবল দলের কর্মকর্তাদের। সেজন্য অন্য জেলাকে টেক্কা দিয়েছে চব্বিশ পরগণা ক্রীড়া সংস্থা। কারণ তারা জেলা অফিস ফুটবল লিগের প্রথম দাবীদার।

এছাড়াও জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ফুটবল লিগের তিনটি ডিভিসনে খেলা হচ্ছে। প্রতিটি ডিভিসনে দলগুলিকে দুটি বিভাগে খেলানো হচ্ছে। লিগের খেলা প্রায় সমাপ্তি পথে। তৃতীয় ডিভিসনের খেলা শেষ। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়েছে সুখচর ইউ এফ সি এবং এক্স অ্যালুমনি ক্লাব। তৃতীয় ডিভিসনে মোট ঊনত্রিশটি ক্লাব এবার খেলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসনে একুশটি করে মোট বিয়াল্লিশটি ক্লাব লড়েছে।

চব্বিশ পরগণা জেলায় আন্তঃ মহকুমা ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা ১৯ আগস্ট শুরু হয়েছে। খেলাগুলি জেলার বিভিন্ন মহকুমার মাঠে হচ্ছে। এর দরুন প্রতিটি মহকুমার, গ্রামের বহু খেলোয়াড় খেলছে। একথা জানালেন জেলা ক্রীড়া সংস্থা সাধারণ সম্পাদক বিজয় গাঙ্গুলি।

লামডিং-এ দাবা

সংবাদদাতা ঃ 'ব্লাড মাউথ ক্লাব' আয়োজিত 'নক আউট দাবা' প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ২১ আগস্ট 'আজাদহিন্দ পাবলিক লাইব্রেরিতে' উত্তেজনার মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে। মোট ২৪ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেছিল। স্থানীয় ইউ বি আই, লামডিং কলেজ, রেলওয়ে অফিস, ইউনাইটেড ক্লাব, রেলওয়ে হাইস্কুল, ভ্রাতৃ মিলন সংঘ, লামডিং কালীবাড়ী প্রভৃতি সংস্থা থেকে ২২ জন এবং বদরপুর ও শিলং থেকে একজন করে প্রতিযোগীর যোগদানের ফলে খেলার আকর্ষণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ফাইনালে সৌমেন্দু বিকাশ চৌধুরী ২-০-তে অবিনাশ মজুমদারকে পরাজিত করেন। সেমিফাইনালে পরাজিত আর বি বর্মন ও আশু গোস্বামী, দুইজনের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন আর বি বর্মন। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন লামডিং কলেজের অধ্যক্ষ সুখময় মজুমদার এবং ফাইনাল খেলা পরিচালনা করেন মণি সেনগুপ্ত।

ঢাকায় সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লিগের প্রথম পর্যায় শেষ

ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহীদ : ঢাকায় সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লিগের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। কথা মত লিগ টেবিলের প্রথম আটটি দলকে নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে সুপার লিগ পর্যায়ের খেলা শুরু হবে। গণ্ড-গোল, ঘাপলা, খেলা বন্ধ, পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি সব মিলিয়ে একটা মিশ্র ফল নিয়ে এবারের লিগের প্রথম পর্যায় শেষ হল বর্তমান লিগের অংশগ্রহণকারী দল সমূহের কর্তাব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনায়। ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতার দরুন, অনৈক্যের দরুন ফুটবলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। দ্বিতীয় বিভাগে যে দুই দল নেমে যাচ্ছে তাদের ক্ষোভ তো আছেই তা ছাড়াও ক্ষোভ জমা হয়েছে গতবছরের চ্যাম্পিয়ন ও বর্তমান লিগ টেবিলের দু'নম্বর দল মোহামেডান স্পোর্টিং-এর। ক্ষোভ জমা হয়েছে বাংলাদেশ ওয়াপদা দলের ব্যবস্থাপক ও সমর্থকদের মনেও।

নীচের দুটো দলের একটি অর্থাৎ ফায়ার সার্ভিসের ক্ষোভ সোচ্চারে প্রচারিত হয়েছে। স্টেডিয়াম চত্বরে একটু ঘোরাফেরা করলেই তা শোনা যাচ্ছে। আর এ ক্ষোভের পিছনে যে যুক্তি নেই এমন নয় আর সেসব যুক্তিগুলো একপেশে বা খেলার উন্নয়ন পরিপন্থী একথাও বলা চলে না। ওয়াপদা দলের ক্ষোভ অনেকটা একই কারণে—তাদের কথা হল কোন কোন দলের ব্যবস্থাপকদের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি বলেই লিগ ব্যবস্থাপনায় ও সমাপ্তিতে এমন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করতে বাধ্য হয়েছে। মোহামেডানের ক্ষোভের কারণ একটু অন্য ধরনের এবং তা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না মোহামেডান কর্মকর্তা বা সমর্থকদের পক্ষেও। তবে একথা মনে করা যেতে পারে যে লিগে তাদের প্রত্যেকটি অসমাপ্ত খেলার পয়েন্টই বিপক্ষ দলকে দেওয়ায় তারা খুশী হতে পারেনি।

অতএব বিভিন্ন দলের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঢাকার সিনিয়র ডিভিসন লিগের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে।

ঈদের ছুটির পর বিকেলে সন্ধ্যায় খেলা চলেছে। খেলায় যাতে কোন রকম অপ্রীতি-কর ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল —এবং যেহেতু তেমন কোন গণ্ডগোল হয়নি অতএব ব্যবস্থাপকগণ সফল হয়েছেন। ঈদের পর বেশ কটি বড় খেলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মোহামেডান বনাম আবাহনীর খেলা। খেলা হয়েছে ফ্লাডলাইটে, মানুষের ভীড়ে উপচে পড়া ঢাকা স্টেডিয়ামে।

লিগের পয়েন্ট হিসেব করলে এ খেলার গুরুত্ব তেমন ছিল না ঠিকই কিন্তু এটা ছিল মর্যাদার লড়াই। একদিকে মোহামেডান শুধু গতবারের চ্যাম্পিয়নই নয় বরং তাদের ক্রীড়া ঐতিহ্যের দরুন বর্তমান ঢাকার সবচেয়ে সমর্থকপুষ্ট দল। তার ওপর এবারের লিগ শুরু হওয়া থেকেই তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ফাইট দিয়েছে শক্তভাবে। অপরদিকে আবাহনী দল গোড়ায় খারাপ করলেও সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করে অনেক পথ হেঁটে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে লিগের মাথায় রাখতে পেরেছে নিজেদের। তাছাড়াও যে কারণটা এ খেলাকে মর্যাদাপূর্ণ করেছে তা হল প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো দলই সমসাময়িক সময়ের ব্যাপ্তিতে অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার প্রথম বিভাগ লিগের অন্যতম চ্যাম্পিয়ন দল। দুটো দলের সমর্থক এখন দেশব্যাপী। ইতিমধ্যে লিগ এবং আগা খান গোল্ড কাপ প্রতি-যোগিতায় একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমেছে মোট চোদ্দ বার তার মধ্যে আবাহনীর জিত হয়েছে সাতবার, মোহামেডানের চারবার এবং ফলাফলে কেউ জেতে বা হারেনি এমন হয়েছে তিন বার। অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে এবারের লিগে এই দুই প্রতাপশালী দলের খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়াম ছেয়ে ভীড়ও হয়েছিল— আর খেলাও হয়েছে অনেক পরিচ্ছন্ন এবং উত্তেজনাপূর্ণ। লড়াই চলেছে সমানে সমানে—'কেহ কারো কাছে চাহেনি হারিতে।' তবু হারতে হয়েছে। এবারেও হেরেছে মোহামেডান। আর বিজয়ী হয়েছে আবাহনী। তাদের জিতের হিসেবে হয়েছে আটটি। আর গত আট বছরে সবচেয়ে বেশী গোলের ব্যবধানে তারা বিজয়ী হয়েছে মোহা-মেডানের বিরুদ্ধে এবারেই, ৩-১ গোলে। বিরতির সময় বিজয়ী দল এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে।

খেলাটা যদিও শুরুর আগে ভাবা গিয়েছিল হবে নার্ভের কিন্তু তা হয়নি—হয়েছে মাঠে। খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়ী বৈশিষ্টে। প্রথম থেকেই আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মাধ্যমে ফুটবল আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল সেদিন। মোহামেডান দলের দ্রুত তালের ফুটবলকে প্রতিহত করতে আবাহনী আরও দ্রুত ফুটবল না খেলে ধৈর্য সহকারে যেমনটি দরকার তেমন ধৈর্য ধরেছে। কাঠিন্য দেখিয়েছে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা। কুণ্ঠাহীনভাবে বলা চলে সেদিন আবাহনীর রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রাই আপন আপন ফুটবল সৌকর্য দেখিয়ে উপস্থিত হাজার হাজার ফুটবল প্রিয়-দের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছে। রক্ষণ-ভাগের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তা যেমন সবাইকে চমকে দিয়েছে তেমনি আবাহনীর আক্রমণ-ভাগের খেলোয়াড়দের সমঝোতা, সুযোগের সদ্ব্যবহার, পরিকল্পিত, সক্ষম, বলিষ্ঠ ও কার্যকরী আক্রমণ ধারা রচনা চমৎকৃত করেছে সকলকে।

মোহামেডান দল দ্রুততালে খেলে আক্রমণ চালিয়েছে সম্মিলিতভাবে, কিন্তু সক্ষম হয়নি আবাহনীর রক্ষণভাগকে ফাঁকি দিতে— একবারের বেশী পারেনি জালে বল ঢোকাতে। যদিও গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল তারা একাধিক। অবশ্য তারা যদি সেই সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতো তাহলে নিঃসন্দেহে এ বছরের সেরা খেলাটি আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হতো—ফুটবল-প্রিয়রা আরও তৃপ্ত হতেন।

প্রথমার্ধে আবাহনীর পক্ষে প্রথম গোল করেন আনোয়ার ৯ মিনিটের সময়। এ গোলের জন্য আনোয়ার খুব একটা কৃতিত্বের



১৯৭৯-র ঢাকা লিগের সেরা দল আবাহনী ক্রীড়াচক্র / খন্দকার তারেক

সিনিয়র ডিভিসন লিগে আগামীবার খেলবে দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন আরামবাগ বয়েজ / খন্দকার তারেক



দাবীদার ছিলেন না৷ যদিও তিনি বলটাকে মাঠের দাক্ষিণ দিক থেকে গোলমুখে সেণ্টার করেছিলেন কিন্তু তা যে মোহামেডানের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বাদলের বুকে লেগে জালে ঢুকবে তা যেমন তিনি ভাবেননি— মোহামেডানের গোলরক্ষক সান্টুও তা ভাবতে পারেননি অতএব প্রথম গোলটা হয়েছে। প্রথম গোল হওয়ার ৯/১০ মিনিটের সময় আবাহনীর রাইট উইংগার আনোয়ারের কাছ থেকে বল পেয়ে তাদের অন্যতম ফরোয়ার্ড হেলাল যেভাবে নিখুঁত ডজের সাহায্যে সান্টু-কে বোকা বানিয়ে জালে বল ঢুকিয়েছে তাও নজিরবিহীন।

দু'গোলে পিছিয়ে গিয়ে মোহামেডান মরিয়া হয়ে ওঠে গোল পরিশোধের জন্য। হামলা চালায় একের পর এক আবাহনীর এলাকায়। অসফল আক্রমণের মধ্যে থেকে এরই মধ্যে একবার আচমকা বেশ দূর থেকে মোহামেডানের লিংকম্যান রামা একটা কড়া শট নিয়ে পরাভূত করেন আবাহনীর গোলরক্ষক মঈনকে আর সেই সুবাদে প্রথমার্ধ শেষ হয় ২—১ গোলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবাহনীর অধিনায়ক চুন্নু সান্টু বাদে আরও দুজন মোহামেডান দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়কে কাটিয়ে দলের পক্ষে যে গোলটি করেন সেটা ছিল অভূতপূর্ব৷ সারা স্টেডিয়ামকে উল্লসিত, আনন্দিত করেছিল সে গোল। এর পরে উভয় দলই খেলেছে, গোলের চেষ্টা করেছে কিন্তু গোল করতে পারেনি ফলাফল তাই শেষ পর্যন্ত ৩—১ গোলে আবাহনীর পক্ষে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি সেদিনের আবাহনীর জয় একটা গৌরবময় সাফল্য তাদের ।

আবাহনী-মোহামেডান ছাড়া ইতিমধ্যে আর যে সব উল্লেখযোগ্য খেলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা ছিল আবাহনী বনাম রহমতগঞ্জের খেলাটি। রহমতগঞ্জ প্রথমার্ধে ১—০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ করেছে ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে পয়েণ্ট বণ্টনের মাধ্যমে। খেলাটা হয়েছিল বৃষ্টি ভেজা কাদা-মাখা মাঠে। তবু খেলাটা ছিল প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ভরপুর। যার দরুন সকলেই উপভোগ করেছিল খেলাটা প্রাণভরে। প্রথমার্ধে রহমতগঞ্জ বেশ কাবু করেছিল আবাহনীকে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি তারা। আবাহনীর আক্রমণকে রহমতগঞ্জের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা যেভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রথমার্ধে, তেমনটি তারা পারেননি দ্বিতীয়ার্ধে। অপরদিকে আবাহনীর ফরোয়ার্ডরাও খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি সেদিনের খেলায় যার জন্য ১—১ গোলে অমীমাংসিত ফলাফলকে সন্তুষ্ট মনে মেনে নিতে হয়েছে আবাহনীকে।

প্রথম পর্যায়ের লিগের শেষ খেলাটা ছিল গতবারের লিগ জয়ী মোহামেডান ও গতবারের লিগ রানার্স আপ ব্রাদার্স ইউনিয়নের মধ্যে। এ খেলায় মোহামেডান খেলোয়াড়রা তাদের খেলায় ফুটবলের যে উৎকর্ষতা দেখিয়েছেন তা নজরে এড়ায়নি ফুটবল-প্রিয় দর্শকদের। সেদিনের খেলাটি ছিল মোহামেডান দলের নিপুণতায় ভরপুর। ব্রাদার্সের খেলোয়াড়রা সেদিন যে সব বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন তা মনে হয়েছে নেহাতই জোলো। যার দরুন মোহামেডান দল সহজেই সেদিন জয়কে ছিনিয়ে নিয়েছে—গোল করেছে ৪টি। ব্রাদার্সের খেলোয়াড়রা অবশ্য এক ফাঁকে একটা গোল করে ফলাফল ৪—১ এনেছেন।

প্রথম পর্যায়ের লিগ শেষ হওয়ায় কোন কোন দল সুপার লিগে খেলতে পাবে—তাদের অবস্থা কি তা পরিষ্কার হয়েছে। আবাহনী ক্রীড়া চক্র ১৬টা খেলায় ২৮ পয়েণ্ট পেয়ে লিগ টেবলের শীর্ষে অবস্থান করছে। মোহামেডান ২২ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয়। ব্রাদার্স ইউনিয়ন ২১ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয়। বি জে আই সি ও ২১ পয়েণ্ট পেয়েছে কিন্তু তাদের স্থান হয়েছে চতুর্থ। রহমতগঞ্জ ২০ পয়েণ্ট পেয়ে হয়েছে পঞ্চম। ওয়ারী ক্লাব ১৯ পয়েণ্টে পেয়ে হয়েছে ষষ্ঠ, ওয়াণ্ডারার্স ১৮ পয়েণ্টে ৭ম আর ভিক্টোরিয়া ১৭ পয়েণ্ট পেয়ে হয়েছে অষ্টম দল।

এর পরে যারা আছে তারা হলো: ওয়াপদা ১৫ পয়েণ্ট পেয়ে ৯ম, সাধারণ বীমা ১৪ পয়েণ্ট পেয়ে ১০ম, নবাগত ধানমণ্ডি ক্লাব ১৪ পয়েণ্ট পেয়ে ১১শ, পুলিশ ১৩ পয়েণ্ট পেয়ে ১২শ, আজাদ স্পোর্টিং ১২ পয়েণ্ট পেয়ে ১৩শ, দিলকুশা ১১ পয়েণ্ট পেয়ে ১৪শ দল হয়েছে।

এ ছাড়া যে দুটো দল এবারের লিগে খেলেছিল তারা হলো ফায়ার সার্ভিস আর পি ডব্লু ডি। ফায়ার সংগ্রহ করেছে ১০ পয়েণ্ট আর পি ডব্লু ডি-র সংগ্রহে ছিল ৬। এদের আগামীতে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হবে।

সিনিয়র ডিভিসন লিগে নতুন দল: আরামবাগ বয়েজ: ঢাকায় দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল শেষ হওয়ার পথে আর দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগে সবচেয়ে কৃতী দল আরামবাগ বয়েজ। তারা তাদের সবগুলো খেলায় অংশ নিয়ে (মোট ১৭টি) ২৭ পয়েণ্ট সংগ্রহ করার সুবাদে শিরোপা জয়ী দল। তারা অপরাজিতভাবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবারে। আগামী বছর তারা সিনিয়র ডিভিশন লিগে নবাগতের ভূমিকা পালন করবে।

বাগদাদে বাংলাদেশী তরুণ কুস্তি দল: বালকদের জন্য ইরাকের রাজধানী বাগদাদে এবার এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়ন-শিপের আসর বসেছে ১ সেপ্টেম্বর, চলবে তিন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সৌখীন কুস্তি ফেডা-রেশনের সাধারণ সম্পাদক তবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কুস্তিদল বাগদাদ গেছে। যে দুই তরুণ মল্লযোদ্ধা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে গেছে তারা: মোহম্মদ ফারুক আহমেদ ও খয়েরুজ্জামান।

রেফারি দলিল খান 'ফিফা' ব্যাজ পেলেন: বাংলাদেশের অন্যতম ফুটবল রেফারি দলিল খান সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি সম্প্রতি 'ফিফা' ব্যাজ পেয়েছেন। এক কালের কৃতী ফুটবলার

জনাব খান ব্যক্তিগত জীবনে ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত গত এশিয়ান গেমসে কৃতিত্বপূর্ণ পরিচালনার দরুনই তিনি এই সম্মানজনক ব্যাজ লাভ করেন ও আন্তর্জাতিক রেফারি হিসেবে স্বীকৃত হলেন। দলিল খান ছাড়া বাংলাদেশের অপর ফিফা ব্যাজধারী রেফারি হলেন জেড আলম।

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল সিউল গেল: প্রেসিডেন্টস কাপ ফুটবলে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের পথে ঢাকা ত্যাগ করেছে সম্প্রতি। সিউলে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বরে। ২২ সদস্যের বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার হয়ে গেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান।

বাংলাদেশ দলের কৃতী স্ট্রাইকার আবাহনী ক্রীড়া চক্রের সালাহউদ্দিন এবারের জাতীয় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সম্ভাব্য সেরা খেলোদের নিয়ে গঠিত এ দল উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া প্রদর্শনে সক্ষম হবে বলেই বিশ্বাস। দলের সহকারী অধিনায়ক হয়েছেন আকু ইউসুফ। এরা ছাড়া আর যে সব খেলোয়াড় গেছেন তারা হলেন: শহীদুর রহমান সান্টু, শফিউল আরেফিন টুটুল, জাকির হোসেন বাদল, রকিবুল ইসলাম, মহসীন, হাসানুজ্জামান খান বাবলু, খোরশেদ আলম, বাবুল, আবদুল হালিম, আশরাফুদ্দিন আহমেদ চুন্নু, শহীদউদ্দিন আহমেদ সেলিম, স্বপন কুমার দাস, আবদুস সালাম, কাজী আনোয়ার, মহম্মদ আসলাম, ওয়াহিদুজ্জামান পিন্টু।

১৭ জন খেলোয়াড় আর ম্যানেজার ছাড়া আর যারা কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষক হয়ে সিউল গেছেন তারা হলেন: তদানীন্তন পাকিস্তান ফুটবলের অন্যতম নায়ক সর্বজনাব নবী চৌধুরী (সহকারী ম্যানেজার), সাহেব আলি (প্রশিক্ষক), মহিউদ্দিন চৌধুরী (রেফারি) এবং চিকিৎসক ডাঃ মাহমুদ।

৬.৯.৭৯

উত্তরপূর্ব ভারত টেবল টেনিসে আসামের জয় জয়কার

গৌহাটির প্রতিনিধি: গৌহাটির কৃষ্টি বিকাশ সংঘ আয়োজিত তিনদিনব্যাপী উত্তরপূর্ব ভারত টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল গৌহাটির ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে। সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মোট ৬০ জন ছেলেমেয়ে এতে অংশ নেয়। এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল '৭৭ সালে। গত বছর নানা আর্থিক ঝামেলায় যদিও প্রতিযোগিতা হতে পারেনি, কিন্তু এ বছর থেকে উদ্যোক্তারা আবার এ প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন। আসামের মোনালিসা বরুয়া পেয়েছে ত্রিমুকুট। মহিলা ও বালিকা সিঙ্গলসে সে হারায় ভারতের বালিকা বিভাগের এক নম্বর খেলোয়াড় মদালসা হাজারিকাকে সরাসরি সেটে। মহিলা ডাবলসে এই মাদালসাকে জুটি নিয়ে ২-০ গেমে হারায় আসামেরই আরতি দেবী ও কুমকুম বেজবরুয়াকে। ওপেন ইভেণ্ট ছাড়াও আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতাও হয়েছিল সাতটি যোগদানকারী ক্লাবের মধ্যে। ফাইনালে গৌহাটির ইয়ং রু ক্লাব ৩-১ গেমে কৃষ্টি বিকাশ সংঘকে হারিয়ে পদ্মধর বরুয়া স্মৃতি ট্রফি পায়।

ফাইনাল প্রতিযোগিতার বাকি ফল:— পুরুষ সিঙ্গলসে রাজীব সাইকিয়া হারায় মণিদীপ সেনকে ৩-১ গেমে। বালক সিঙ্গলসে মণিদীপ হারে ভারতের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন গৌতম হাজারিকার কাছে ৩-২ গেমে। সাব জুনিয়র বালিকা বিভাগে ভারত চ্যাম্পিয়ন মিতা সিনহা রায় হারায় ঘৃতাচি হাজারিকাকে সরাসরি ২-০ গেমে। পুরুষ ডাবলসে রাজ বরুয়া ও গৌতম হাজারিকা ২-১ গেমে রাজীব সাইকিয়া ও আব্বাসউদ্দিন আহমেদকে হারায়। বালক ডাবলসে মণিদীপ সেন ও বিশ্বদীপ বরা হারিয়ে দেয় নৌকিবউদ্দিন আহমেদ ও গোবিন্দ উপাধ্যায়কে ২-১ গেমে। সাব জুনিয়র বালক বিভাগে অরুণজ্যোতি বরুয়া ২-১ গেমে বিশ্বদীপ বরাকে।



উত্তরপূর্ব ভারত টেবল টেনিস বিজয়ীরা: বাঁদিক থেকে—রাজীব সাইকিয়া, গৌতম হাজারিকা, অরুণজ্যোতি বরুয়া, মোনালিসা বরুয়া ও মিতা সিনহা রায় / লক্ষ্মণ পোদ্দার

গৌহাটির প্রথম ডিভিসন ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব

গৌহাটির প্রতিনিধি: সুপার লিগের শেষ খেলায় গৌহাটির টাউন ক্লাব গতবারের বিজয়ী নবজ্যোতি ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে এবার প্রথম ডিভিসন লিগ চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে। সুপার লিগের চারটি খেলায় টাউন পেয়েছে আট পয়েন্ট। নবজ্যোতি ছয় পয়েন্ট পেয়ে হয়েছে রানার্স।

কয়েকবছর ধরে প্রথম ডিভিশনে খেলবার পর রাইজিং একাদশ গতবছর দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে গিয়েছিল। এবার তারা গোলের গড়ে কামরূপ পুলিসকে হারিয়ে 'বি' ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর আবার 'এ' ডিভিসনে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

পত্র লেখকদের প্রতি

পত্র লেখকদের কাছে অনুরোধ—চিঠি সংক্ষেপে লিখুন। কাগজের এক পিঠে লিখুন। দুই দিকে লেখা চিঠি ছাপা সম্ভব নয়, তা ওই চিঠি যতই ভাল হোক। আর একই বিষয় নিয়ে লিখবেন না। পাঠকের কলমে সাম্প্রদায়িকতা বা ব্যক্তিগত আক্রোশ যেন প্রকাশ না পায়। চিঠি স্পষ্ট করে লিখুন, চলতি ভাষায় লিখুন এবং ইংরাজি শব্দ এড়িয়ে চলুন।

—সম্পাদক

সারা ভারত ও নেপাল সাইকেলে অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলার দুই তরুণ এখন গৌহাটিতে

পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ গ্রামের দুই তরুণ ন'মাস ধরে সারা ভারত ও নেপালের প্রায় ১৯৭০০ কিলোমিটার পথ সাইকেলে অতিক্রম করে গৌহাটি পৌঁছয় ১১ আগস্ট। যাত্রা শুরু হয়েছিল গত বছর সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখে। এই দুঃসাহসী দুই তরুণ স্বপন কুমার বিশ্বাস (২৩ বছর) ও গৌর সরস্বতীর (২৪ বছর) সাইকেলে ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিভিন্ন লোকের সামাজিক রীতিনীতি প্রত্যক্ষ করা। যদিও ফল লাভের বাইরেও অ্যাডভেঞ্চারের প্রবণতাই তাদের বেশী প্রভাবিত করেছিল। কলকাতা হয়ে কটক, ভুবনেশ্বর, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, মাদুরাই, কন্যাকুমারী, ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, মহীশূর, গোয়া হয়ে তারা বোম্বাই পৌঁছায় ২ মার্চ। সেখান থেকে দুই সাইক্লিস্ট দুই ভিন্ন পথে যাত্রারম্ভ করে। একজন অজন্তা, ইলোরা, বরোদা, আমেদাবাদ, রাজকোট, পোরবন্দর, মাউণ্ট আবু, আজমীড় হয়ে জয়পুর, দিল্লী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ ছুঁয়ে লক্ষ্ণৌ। আর একজন সুরাট, গান্ধীনগর, উদয়পুর, আগ্রা হয়ে দিল্লি, অমৃতসর, শ্রীনগর, সিমলা, গোয়ালিয়র, তারপর কানপুর হয়ে লক্ষ্ণৌতে দু'জনে মিলিত হয় ১০ জুন।

সেখান থেকে দুই বন্ধু যাত্রারম্ভ করে ১৭ জুন। অযোধ্যা হয়ে নেপালের লুম্বিনিতে প্রবেশ করে পোখরা, কাঠমাণ্ডু হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত দুর্গম পার্বত্য পথে এই যাত্রা সাইক্লিস্টদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ১৯৭০০ কিলোমিটার পথ সাইকেলে অতিক্রম করতে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হাঁটতে হয়েছে। কখনবা সাইকেল বিগড়ে গেছে। তাছাড়া কাঠমাণ্ডু থেকে শিলিগুড়ি এবং গৌহাটি থেকে শিলং পর্যন্ত খাড়াই পাহাড়ী পথে সাইকেলে ওঠাও সম্ভব ছিল না।

পুনেতে যাদুকর জুনিয়র পি সি সরকারের সঙ্গে দেখা। অভিভূত হয়ে লিখে দিয়েছেন—ইট ইজ গ্রেট প্লেজার টু মিট ইউ হু হ্যাজ বিন ডিসকভারিং দি ওয়ার্ল্ড' অব ম্যাজিক ইন ইণ্ডিয়া ইন এ নবেল ওয়ে—বাই সাইক্লিং। মিটিং ইউ ইন পুনে এবাউট ২০০০ কিলোমিটার এওয়ে ফ্রম হোম ইজ এ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হাউ এক্সাইটিং, কালারফুল এ্যাণ্ড এটদা সেমটাইম পেইনফুল দি ট্যুর ইজ।



গৌহাটিতে পশ্চিম দিনাজপুরের দুই সাইক্লিস্ট; স্বপন কুমার বিশ্বাস ও গৌর সরস্বতী। / লক্ষ্মণ পোদ্দার

প্রমোশন অব অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রাম, মিনিস্ট্রি অব অ্যাডুকেশন-এর তত্ত্বাবধানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এদের সাহায্য করেছেন। তাছাড়া পশ্চিম দিনাজপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর নিবসাইলাম, কালিয়াগঞ্জের পূর্বাশা স্পোর্টিং ক্লাব ও কালিয়াগঞ্জ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছেও এরা বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞ। ●

শব্দ জব্দ

অভিজিৎ দে,
চুচুঁড়া ডাফ হাইস্কুল,
পোঃ-চুচুঁড়া, জেলা-হুগলী।

পাশাপাশি

১। এই নিয়মটি দাবা খেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৩। ব্রাজিলের অন্যতম বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলার ওয়ালডির পেরিরাকে এই ছোট্ট নামে সকলে চিনত।

৪। ক্রিকেটে অভিজাত মারগুলির মধ্যে অন্যতম।

৮। ১৯৭৭ সালে ভেটারেন্স ক্লাব নির্বাচিত বর্ষ শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবলারটি এবছর একটি প্রথম ডিভিসন দলের হয়ে মাঠে নেমেছেন।

৯। প্রথম 'অর্জুন' পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কোয়াশ খেলোয়াড়।

১০। ১৯৩৯ সালে প্রথম লিগ জয়ী মোহনবাগান দলের রক্ষণের দুর্ভেদ্য খেলোয়াড়।

১২। এই খেলাটিতে প্রতিযোগীদের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় না।

উপর-নীচ

১। বৃটেনের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই বক্সারকে রিংয়ের রাজা মহম্মদ আলি সহজেই কুপোকাৎ করেছিলেন।

৩। 'ফুটবল সম্রাট' পেলেকে অনেকে এই নামে ডাকতেন।

৫। সব খেলা শুরু হওয়ার আগেই এই কাজটি সেরে নেওয়া হয়।

৬। সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট সিরিজের তৃতীয় টেস্টের নায়ক।

৭। তেত্রিশতম জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল এই শহরে।

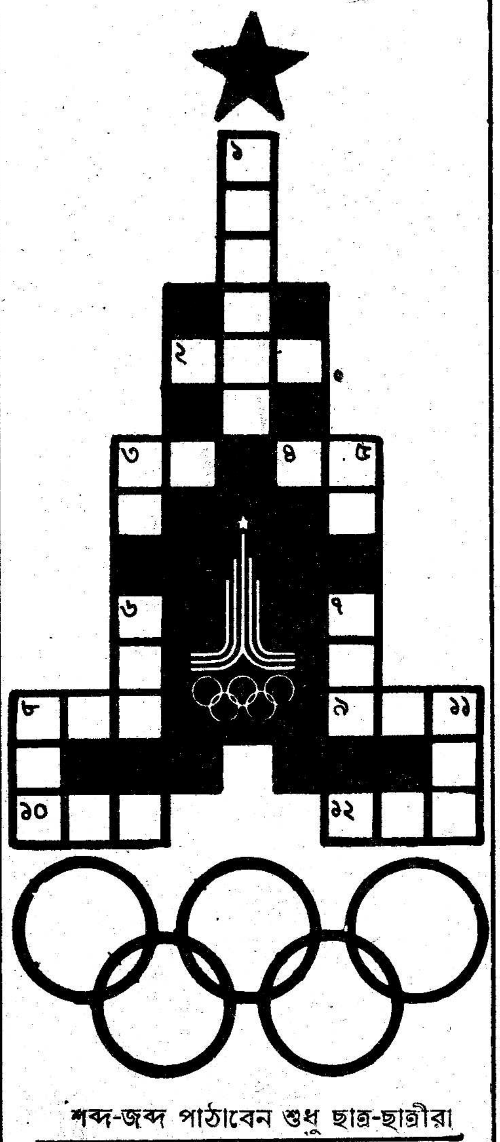
৮। ১৯৭৭ সালে জাতীয় ফুটবলে নিজের দাপট দেখিয়ে নজর কেড়ে নেওয়া খেলোয়াড়দের অন্যতম।

১১। এবছর ফরাসী ওপেন টেনিসে ছেলেদের জুনিয়র বিভাগ জয়ী খেলোয়াড়।

সম্পাদক
'খেলার আসর' পত্রিকা
প্রিয় মহাশয়,

আমি গত দু'বছর আপনার খেলার আসর পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার 'শব্দ-জব্দ' বিভাগ আমার কাছে খুবই প্রিয়। অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে আপনাদের দপ্তরে আমিও একটি 'শব্দ-জব্দ' (সমস্যা) পাঠাই। কিন্তু কিছুতেই মনের মত হয় না। বহু দিন চেষ্টার পর কিছুটা সফল হয়েছি বলে মনে করি। এবারের 'শব্দ-জব্দ'-এর ছকটি ১৯৮০-র মস্কো ওলিম্পিকের প্রতীকের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আমার মনের মত হয়ে কি লাভ, আপনাদের মনের মত হলে তবেই তো আমার চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে করব। এটির সঙ্গে আপনার দেওয়া ছকটি পূরণ করলাম এবং প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও বিদ্যালয়ের শীলমোহর পাঠালাম। এখন আপনার বিবেচ্য বিষয়।

ধন্যবাদান্তে—ইতি—
অভিজিৎ দে,
ডাফ্ হাইস্কুল, চুচুঁড়া।



শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা

শব্দ-জব্দ'র সমস্যা সৃষ্টি ও তার প্রতিকারের দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদের। তবে আমাদের ইচ্ছা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই তা সীমিত থাক। তাঁরা যেন সমস্যা ও সমাধান একই সঙ্গে আমাদের কাছে পাঠান। যাদের পাঠান শব্দ-জব্দ ছাপা হবে তাঁরা পুরস্কার স্বরূপ পঁচিশ টাকা পাবেন। তবে নিজ নিজ স্কুলের প্রধানের সার্টিফিকেটসহ শব্দ-জব্দ পাঠান আবশ্যিক। সঙ্গে পুরো নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের নাম লিখতে ভুলবেন না।

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান

নাম ________

অভিভাবকের নাম ________

ঠিকানা ________

বিদ্যালয় ________

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ________

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ________



মস্কো '৮০

রেখাচিত্রে ওলিম্পিক ক্রীড়া—পিকটোগ্রাফস

অতীন সরকার ঃ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক ক্রীড়া বিষয় বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে হয়। আর তাতে অংশগ্রহণ করতে বা দেখতে আসেন নানা দেশের নানা ভাষা-ভাষী মানুষ। ফলে ভাষার সমস্যায় ক্রীড়াঙ্গনের সন্ধান পাওয়া এবং ক্রীড়াঙ্গনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় কোন ক্রীড়াঙ্গনে কি হচ্ছে তা বোঝাবার জন্য ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকে পিকটোগ্রাফের প্রবর্তন ওই বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো ওলিম্পিকে প্রাচীন আজটেক লিপি অনুসরণে ক্রীড়াঙ্গনের সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে মিউনিখ ওলিম্পিকে ল্যাকোনিক জিওমেট্রিক ধরন ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৬ সালে মণ্ট্রিল ওলিম্পিকে ব্যবহৃত হয় মিউনিখ পিকটোগ্রাফস-এর পরিমার্জিত রূপ।

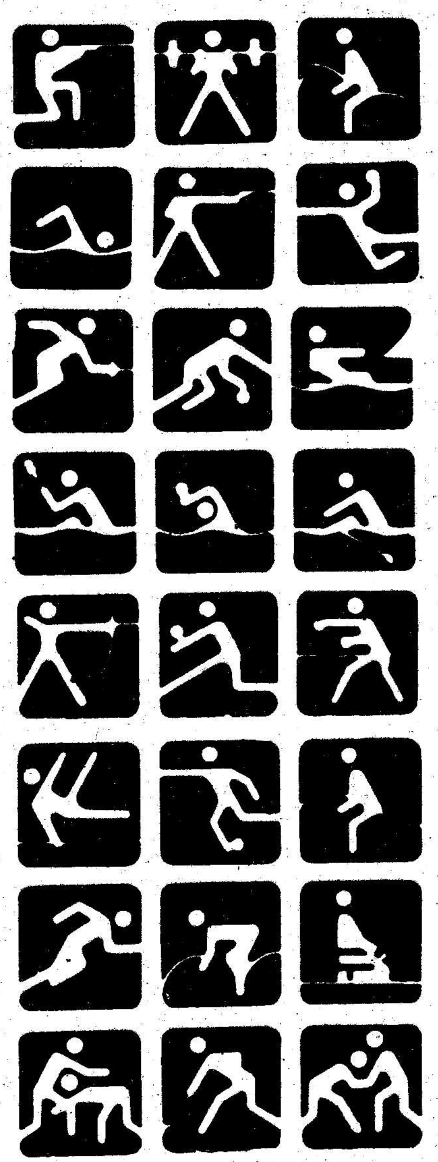
মস্কো ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দর্শকরা দেখবেন এক নতুন পিকটোগ্রাফস সেট। লেনিনগ্রাডের মুখিনা হায়ার স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর ছাত্র ও আধুনিক পেণ্টাথলনে উচ্চমানের ক্রীড়াবিদ ২৭ বছর বয়স্ক নিকোলাই বেলকভ ওই প্রতীকগুলির নক্সা তৈরি করেছেন।

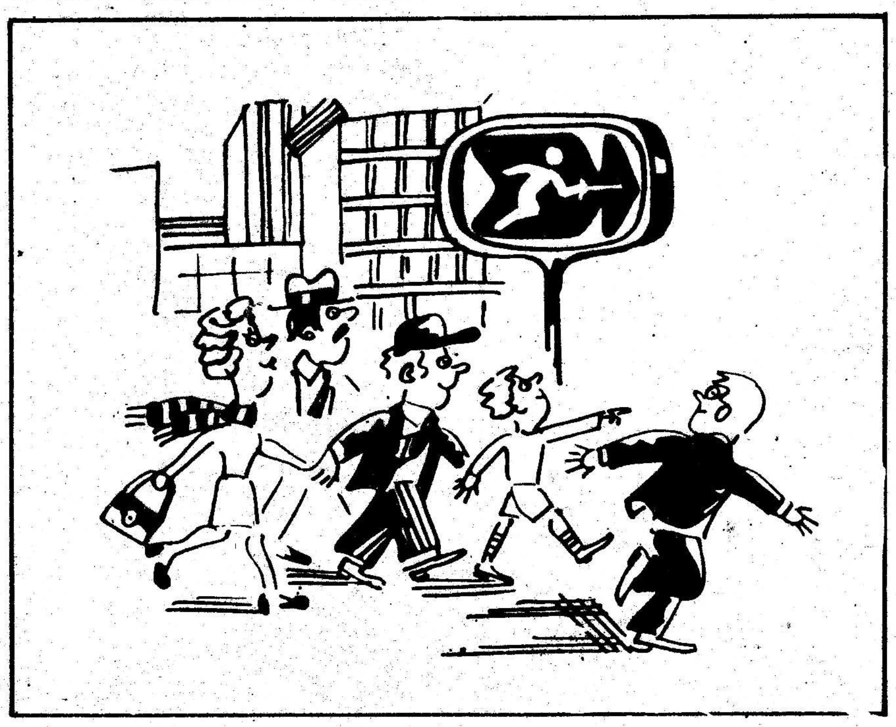
বেলকভ-এর পিকটোগ্রাফস-এর বৈশিষ্ট্য এগুলি রেখাযুক্ত এবং উচ্চমানের। এতে সুবিধা হল এগুলি চারটি ভিন্ন দিক থেকে ব্যবহার করা যাবে। সোজা ও উল্টো এবং তার উল্টো। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য পিকটোগ্রাফগুলি পাশাপাশি রাখলে দেখা যাবে একটি আর একটির সঙ্গে যুক্ত। এতে ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন রঙ ও পশ্চাদপট। ক্ষুদ্রতম আকারের পিকটোগ্রাফগুলি ওলিম্পিক দলিল চিত্রের ফিল্মে ব্যবহার করা যাবে।

মস্কো ওলিম্পিক ক্রীড়াসূচিতে ২১টি বিষয় থাকলেও এ পর্যন্ত ২৪টি পিকটোগ্রাফ করা হয়েছে। মিউনিখে কুস্তির (রেস্টলিং) ১টি চিহ্ন থাকলেও এখানে শিল্পী ফ্রি স্টাইল ও গ্রিকো রোমান পদ্ধতির জন্য আলাদা পিকটোগ্রাফ করেছেন। তেমনি সাঁতার ও ওয়াটার-পোলোর জন্য আলাদা করা হয়েছে (মিউনিখে ছিল ১টি)। এখানে পেণ্টাথলনের পিস্তল শ্যুটিং-এর চিহ্ন আলাদা করা হয়েছে যাতে দর্শকরা রাইফেল শ্যুটিং-এর সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন।

নিকোলাই বেলকভের ওই নক্সাগুলি ওলিম্পিক সংগঠন কমিটি অনুমোদন করেছেন।

এখন শিল্পী বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মত হকি ও ভারোত্তোলন প্রতীককে উন্নত করা এবং ডাইভিং-এর জন্য একটি আলাদা প্রতীক করছেন। কারণ মস্কোতে ডাইভিং, ওয়াটারপোলো ও সুইমিং আলাদা জায়গায় হবে।





সিকিমেও জনপ্রিয় খেলা ফুটবল

গ্যাংটক থেকে অমলেন্দু কুণ্ডু

১৫ আগস্ট এখানে সিকিম রাজ্যপাল স্বর্ণকাপ নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল। এই ধরনের টুর্নামেন্ট এই প্রথম। সিকিমের লোকেরা এমনিতেই কলকাতার মানুষের মত ফুটবল প্রেমী। কি বর্ষা, কি শীত ফুটবল খেলা দেখতে কেউ ছাড়ে না। প্রকৃতপক্ষে যে কদিন খেলা হয়, সে কদিন তো সচিবালয় বা সরকারী দপ্তর বেলা দুটোর পর একেবারেই ফাঁকা হয়ে যায়।

৪০ হাজার মানুষের শহর গ্যাংটকে ম্যাচ দেখতে যদি দশ থেকে পনেরো হাজার মানুষ উপস্থিত থাকে তাহলে বুঝতেই পারছেন এরা ফুটবলের প্রতি কি দারুণ আগ্রহী। এই ব্যাপারে মেয়েরাও কম যায় না। ফোল্ডিং ছাতা নিয়ে তারাও পালজোর স্টেডিয়ামে হাজির হয়, নিজের টিমের জন্য গলা ফাটিয়ে বাড়ি ফেরে।

সিকিম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গত ২/৩ বছর ধরে আন্তঃবিভাগীয় ও আন্তঃজেলা ম্যাচ পরিচালনা করছে। প্রাক্তন জি ও সি ইন চিফ জেনারেল জেকব একটা শিল্ডও দিয়েছেন। গত বছর তো সন্তোষ ট্রফিতে এরা টিমও পাঠিয়েছিল, অবশ্য পরাজিত হয়েছে। তবু রাজ্য সরকারের ও প্রাক্তন তথ্য ও শিক্ষামন্ত্রী ভবানীপ্রসাদ দাহালের উৎসাহে ফুটবল ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এদের কাছে মোহনবাগান একটা স্বপ্ন, শ্যাম থাপা এদের গুরু। ওদের বহুদিনের ইচ্ছা নিজেদের প্রিয় টিম মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডান স্পোর্টিংকে গ্যাংটকের মাঠে দেখবে। কিন্তু তা এখনও পূর্ণ হয়নি।

জুলাই এ যখন আন্তঃ বিভাগীয় ফুটবল ম্যাচ শেষ হলো, তখনই রাজ্যপাল বিপিন বিহারী লাল একটি গোল্ড কাপ দেবার কথা ঘোষণা করলেন। স্থির হলো আন্তঃরাজ্যের টিমকেও আহ্বান করা হবে এবং ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন ফাইনালটি হবে।

১০ ভরি সোনা ও ৫০০ ভরি রূপো দিয়ে তৈরী ৩৬ ইঞ্চি উঁচু এই কাপটি যদিও শেষ দিন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। তবে এলেই তা বিজয়ীদের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ পড়েছে ২৫ হাজার টাকা।

সিকিম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান পি কে প্রধান ঘোষণা করলেন, অতিথি টিমের যাতায়াত গাড়ী ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়া খরচ তারা বহন করবেন।

৩০ জুলাই নাম দেবার শেষ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১টি টিম নাম দেয়। তার মধ্যে ৪টি সিকিমের বাইরের টিম। এরা হলো মণিপুরের ইয়ং ফিজিক ইউনিয়ন ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, শিলিগুড়ির কিশোর সংঘ ও কালিম্পং একাদশ।

সিকিম থেকে যোগ দিল তেনডং একাদশ (পামচি, দক্ষিণ জেলা সিকিম), মঙ্গল একাদশ (উত্তর সিকিম জেলা) ব্লাক ক্যাট (আর্মি), সিকিম পুলিশ, ইয়ং অর্কিড, সিকিম সিভিল সার্ভিস ও গ্যাংটক মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।

গ্যাংটকে একমাত্র স্টেডিয়াম পালজোরে (Palzor) ৪ আগস্ট প্রথম খেলাটি হলো কালিম্পং একাদশ বনাম ইয়ং অর্কিডের মধ্যে। মাঝে মাঝে কুয়াশায় ঢেকে গেলেও খেলাটিতে কালিম্পং ইয়ং অর্কিডকে ৪—৩ গোলে পরাজিত করে। খেলাটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল।

পরদিন ৫ আগস্ট দ্বিতীয় খেলাটি এক তরফাই শেষ হলো। গ্যাংটক মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (জি এম সি) বনাম মঙ্গল জেলা একাদশের খেলায় মঙ্গল দাঁড়াতেই পারলো না। পর পর ১১ গোল খেয়ে তাদের মুমূর্ষু অবস্থা। ফলে জি এম সি প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে টুর্নামেন্টে অবতীর্ণ হল। সেমিফাইনালে তারা সিকিমের শক্তিশালী দল সিকিম পুলিশকে রীতিমত লড়ে ১—০ গোলে পরাজিত করলো।

সেমিফাইনালের দ্বিতীয় খেলায় বেঙ্গল বি এস এফ সিভিল সার্ভিসের মধ্যে রীতিমত লড়াই হলেও বি এস এফ সিভিল সার্ভিসকে ৩—১ গোলে হারায়।

৭ আগস্ট ব্লাক ক্যাট (আর্মি) তেনডং একাদশকে ৪—২ গোলে পরাজিত করলো। ফিক্সারে সিভিল সার্ভিসের কাছে টাইব্রেকারে ব্লাক ক্যাট ১—০ গোলে পরাজিত হয়। অনুরূপ ১১ আগস্ট মণিপুর ইয়ং ফিজিক ইউনিয়ন বেঙ্গল বি এস এফের কাছে ১—০ গোলে হারে।

ফিক্সারে সিকিম পুলিশের কাছে ৪—০ গোলে পরাজিত হওয়ায় কালিম্পং একাদশ টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। অনুরূপ শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ খুব ভাল খেলে জি এম সি-র কাছে ০—২ গোলে পরাজিত হয়। অবশ্য এই দিন রেফারির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কিশোর সংঘ মাঠ ত্যাগ করে খেলার ২০ মিনিট আগে।

কিন্তু অভূতপূর্ব যে, সমস্ত দর্শক কিশোর সংঘকেই সমর্থন করলো। যদিও বাইরের দল তবু রেফারির সিদ্ধান্তে যখন কিশোর সংঘ মাঠ ত্যাগ করলো। তখন দর্শকরা তাদের মাথায় করে বাইরে নিয়ে গেল।

১৫ আগস্ট গোল্ডকাপ ফাইনালে জি এম সি বনাম বেঙ্গল বি এস এফ মুখোমুখি হয়।

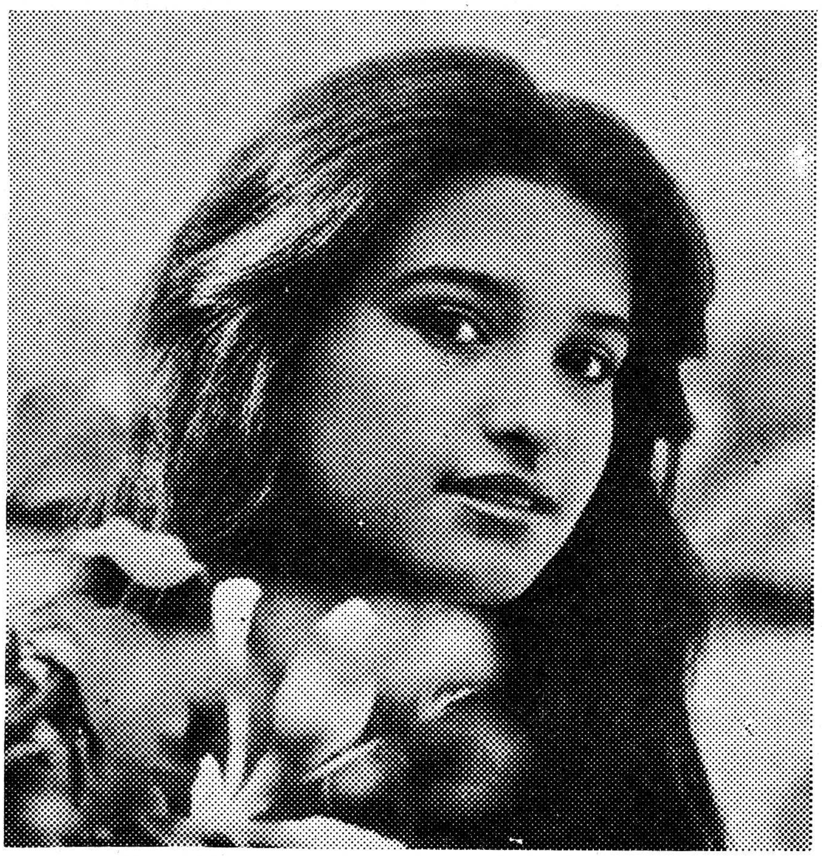
সমস্ত গ্যালারি এবং আশপাশের খোলা জায়গা খেলা শুরুর আগে থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। গ্যাংটক শহরে চলাচল দায় হয়ে পড়ে। এই প্রথম কার্শিয়াং রেডিও স্টেশন খেলার ধারাবিবরণী প্রচার করলো। গ্যাংটক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সহযোগিতায় টেলিফোনের তারের মাধ্যমে সরাসরি রেডিও স্টেশনে রিলে করার ব্যবস্থা হয়।

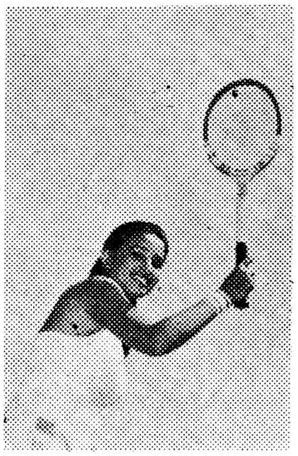
তৎকালীন মুখমন্ত্রী কাজী লেনদুপ দোরজী ও রাজ্যপাল বিপিন বিহারী লাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই খেলাটিতে শেষ পর্যন্ত জি এম সি ভাল খেলে ৫—২ গোলে জয়লাভ করে টুর্নামেন্ট বিজয়ী হয়।



সৌজন্য : জি এম সি / বিধান চক্রবর্তী

কিউটিকিউরা কন্যা
স্বভাবতঃই স্বতঃস্ফুর্ত প্রাণ-বন্যা









একটাই ট্যাল্ক পাউডার— কিউটিকিউরা
যা ওকে সর্বক্ষণ রাখে উজ্জ্বল, উচ্ছ্বল!

এতই সূক্ষ্ম ও কোমল যে যেন ওর মুখে
মেঘের হাল্কা পরশ বুলিয়ে দেয়।

ফুলের সৌরভে ভরা এই ট্যাল্ক
ওর সর্ব অঙ্গ থেকে
স্বাভাবিক সুগন্ধ ছড়ায়।

ভোরের বাতাসের মত
শীতল পরশে ওকে রাখে
কোমলা, তরতাজা।
দিনের প্রতি পল, প্রতি ক্ষণ
ওর লাগে অপূর্ব সুন্দর!



কিউটিকিউরা ট্যাল্ক
**সব মেয়েরই প্রিয় পাউডার—
আর সেটাই তো স্বাভাবিক।**

CHAITRA-MP-9 BEN

ডুগার শিল্ড জিতল অয়েল ইণ্ডিয়া

তেজপুর থেকে লক্ষ্মণ পোদ্দার ঃ এবছর মোট ১৯টি দল নিয়ে ডুগার শিল্ডের আসর বসেছিল তেজপুরের পোলো গ্রাউণ্ডে। ১৯৫৬ সালে এই প্রতিযোগিতার শুরু থেকে ভারতের নামীদলগুলো খেলে গেছে। কলকাতার এরিয়ান, খিদিরপুর, উয়াড়ি, চন্দ্র মেমোরিয়েল, ভ্রাতৃসংঘ, বাটা, জলন্ধরের লিডার্স ক্লাব, হায়দ্রাবাদ টেলিফোনস, ওড়িশা টেক্সটাইলস, ত্রিপুরা পুলিস প্রভৃতি দল ছাড়াও কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গেছে এই তেজপুরের পোলো গ্রাউণ্ডে।

তেজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত এই টুর্নামেণ্টে এবছর উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুই শক্তিশালী দল অয়েল ইণ্ডিয়া ও আসাম পুলিস ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ৪ সেপ্টেম্বর। অয়েল ইণ্ডিয়া দল ১-০ গোলে আসাম পুলিসকে হারিয়ে গতবারের বিজয়ীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখল। অয়েল ইণ্ডিয়া দলের নামী স্ট্রাইকার অমল ফুকন দ্বিতীয়ার্ধের ৩ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করে বিদ্যুৎ ভূঞার পাস থেকে। আসাম পুলিস প্রথমার্ধের দশ মিনিটের মধ্যে তিনটি গোলের সুযোগ নষ্ট করে। প্রথমটি অধিনায়ক গিলবার্টসন সাংমা, দ্বিতীয়টি লেফট আউট সিরাজউদ্দিন আহমেদ। নয় মিনিটে পুলিস দলের গোল করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। সিরাউদ্দিনের পাস থেকে গোলমুখের একেবারে কাছে চলন্ত বলে পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হয় রাইট স্ট্রাইকার কল্যাণ বরো। পনের মিনিটে গিলবার্ট সাংমার সটে নিশ্চিত গোল হেড করে বিপদসীমার বাইরে পাঠায় অয়েল ইণ্ডিয়ার লেফট ব্যাক প্রবীন সানোয়াল।

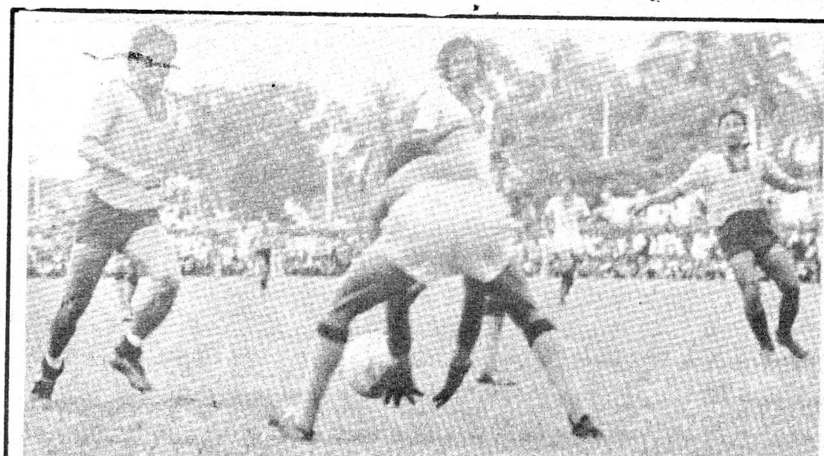
প্রথমার্ধের কয়েক মিনিট ছাড়াও দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পনের মিনিট পুলিস দল অয়েল ইণ্ডিয়ার রক্ষণভাগে বল ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু অয়েল ইণ্ডিয়ার তিন ডিফেণ্ডার পরেশ কাকতি, নিখিল দেব ও প্রবীন সানোয়ালের দৃঢ়তায় অয়েল ডিফেন্স ভেদ করতে পারেনি পুলিস দলের খেলোয়াড়েরা। দ্বিতীয়ার্ধের তের মিনিটে ফকরুউদ্দিন লস্কর পনের গজ দূর থেকে যে ভলি মারে অয়েল গোলরক্ষক ইউ ভি রেড্ডি তা প্রতিহত করে দেয়।

ফাইনালের দিন খেলার আগে ও খেলাচলাকালীন অবিরাম বৃষ্টি উপেক্ষা করে দশ হাজার দর্শক গ্যালারি বিহীন মাঠে ফাইনাল খেলা প্রত্যক্ষ করেন। সারা মাঠে দুটো অস্থায়ী গ্যালারি চোখে পড়েছে তার মধ্যে একটি ছিল মহিলা দর্শকদের জন্য সংরক্ষিত। তাছাড়া মাঠের চারদিকেই দর্শকরা মাটিতে বসে ও দাঁড়িয়ে খেলা উপভোগ করেছেন। যেখানে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নেই সেখানে তেইশ বছরের পুরনো টুর্নামেণ্ট চলছে এখনও গ্যালারি বিহীন মাঠে।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন তেজপুরের ডেপুটি কমিশনারের পত্নী শ্রীমতী ঊষা বরা। ফাইনালে ওঠার আগে ডাবল লেগ সেমিফাইনালে আসাম পুলিশ হারায় আসাম রাইফেলসকে ৪-৩ গোলে। অপর পক্ষে অয়েল ইণ্ডিয়া ২-০ গোলে কোল ইণ্ডিয়া দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

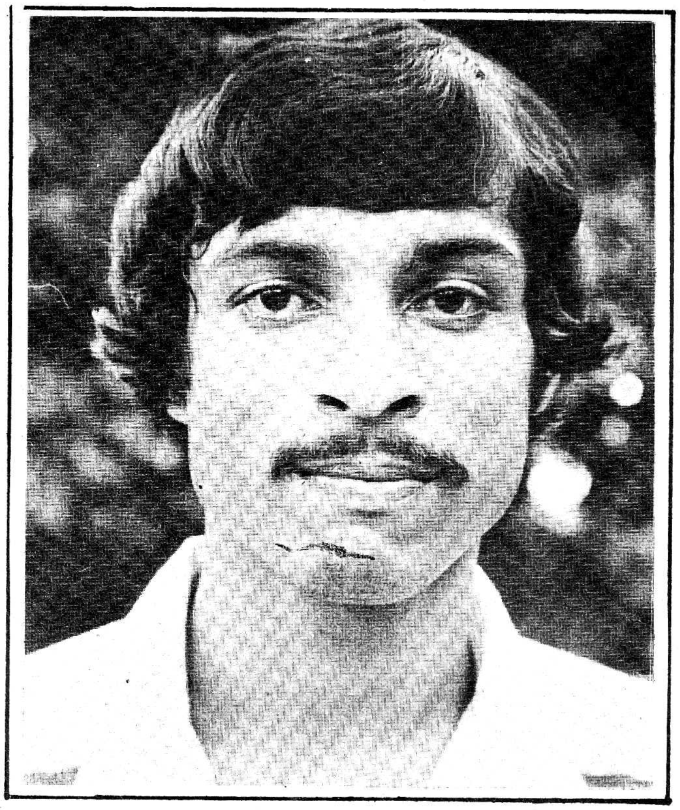


ডুগার শিল্ড বিজয়ী অয়েল ইণ্ডিয়া দল



ছবিগুলি লক্ষ্মণ পোদ্দারের তোলা

আসাম পুলিশের কল্যাণ বরোর পাস থেকে মোমিন বরদলৈ ছুটে আসার আগেই বল আয়ত্তে এল অয়েল ইণ্ডিয়ার গোলকিপার ইউ ভি রেড্ডির কাছে। মাঝে অয়েল ইণ্ডিয়ার নিখিল দেব



প্রতাপ শুধু সাত জুলাইয়ের গোলকিপার নয়

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : —সেদিন তুমি কি ভেবেছিলে ?

—'ভেবেছিলাম ভাল খেলতে হবে, অবশ্যই। যদি তা না পারি, তাহলে আমার ফুটবল জীবনটা হয়ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে। একটাই ভাবনা ছিল—৭৭-এ বিশ্বজিতের যে অবস্থা হয়েছিল, তা যেন আমার না হয়। কথনোই না। আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম—এই ম্যাচটার সাফল্যই আমাকে তুলে এনে দাঁড় করাতে পারে প্রতিষ্ঠার আলোয়।'

—ভয় ভয় করছিল ?

—'হ্যাঁ, মনে হয়েছিল—যদি বিপক্ষকে না রুখতে পারি, গোল না রাখতে পারি অক্ষত এবং যদি কোন বাজে গোল আজ খাই, তবে তার পরিণতি···

—টেণ্টে ড্রেস করার সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে চোখে মুখে সবচেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা ছিল কার ?

—'আমার'। দ্বিধাহীন উত্তর—'কারণ আমি এদিনই প্রথম বড় পদক্ষেপ নিচ্ছি। তাই একটা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল—এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় যদি ফেল করি ? তবু, সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনটাকে শক্ত করলাম—গোল খাবো না। কঠিন সট আসুক, ফিরিয়ে দেব। মাটি কাঁপানো সট আসুক, ঝাঁপাবো। দক্ষতার শেষ বিন্দুতে পৌঁছে প্রতিহত করব বিপক্ষকে।'

—৭ জুলাই দলের দুর্বলতম স্থান হিসাবে তোমাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল—সেটা জানতে ?

—'জানতাম, ভাল ভাবেই। তবু আমি নিশ্চুপ থেকেছি। কারণ, সেটা থাকাই ছিল সঙ্গত ও বুদ্ধিমানের কাজ। কোন কথা বলা তখন আমার সাজেনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এর একটাই উত্তর হতে পারে—ভালো খেলা, দক্ষতার সঙ্গে গোল আগলানো—যেটা আমাকে সমালোচনার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার যোগ্য করে তুলতে পারে।'

—টিম মাঠে নেমে গেছে। খেলা আরম্ভের ঠিক আগে পোস্ট ছুঁয়ে নমস্কার করার সময় কি মনে হয়েছিল তোমার ?

—'কেবল একটা কথাই। আমি বাজে খেললে সমালোচনা বাড়বে। অনেকে বলবে—টিমটাকে হারিয়ে দিয়েছি। আমি সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করেছি, এমন অবস্থার মধ্যে যেন না পড়তে হয়। একে নবাগত, তায় আবার লাস্ট লাইন অব ডিফেন্স। তবে একটা ব্যাপারে আমি কিছুটা ভয়-মুক্ত ছিলাম—দলের রক্ষণ ভাল। ততটা অসুবিধা হবে না।

খেলা শুরু হল। এবং গোড়াতেই মোহনবাগান-ডিফেন্সটা কিরকম এলোমেলো হয়ে গেল। তখন চার মিনিট কেটেছে। সাব্বিরের পায়ে বল, ফাঁকায়। সট করল সে। —'এবং যখনই সেই সটটা ডান দিকে, নীচু হয়ে বুকে আঁকড়ে ধরলাম, মনে একটা জেদ চেপে গেল —আজ সহজে হার মানব না। সাব্বির যদি সটটা বাঁ-দিকে চেপে মারত, কি হত বলা যায় না। তবে ডান দিকেই সে সটটা নিয়েছিল, আর একটু উঁচু থাকলে হয়ত গোল হতে পারত। কারণ আমি তখন নীচু হয়েছি, তাই উঁচু সট হলে তাতে হাত লাগাতে পারলেও পোস্টে লেগে বল জালে জড়িয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। সৌভাগ্য, তা হয়নি।'

—কিন্তু ১৭ মিনিটে সাব্বির গোল করল, হার মানল প্রতাপ এবং তখন ?

—'তখন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, এই বুঝি তলিয়ে যাব। মাঠের অর্ধেকাংশ জুড়ে সেই বিরাট চিৎকার আমার কানে আর্তনাদের মত শোনাচ্ছিল। একটা নার্ভাস বোধ তখন ছেঁকে ধরেছে। কায়মনোবাক্যে আমি ভগবানকে ডাকতে লাগলাম—যেভাবে হোক একটা গোল করে আমার টিম যেন খেলায় সমতা আনতে পারে। টিম যেন হেরে না যায়, যেন হেরে না যায়।'

—গোলের ক্ষেত্রে তোমার কতটা দায়িত্ব ছিল ?

—'বলটা আমি ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারিনি। গোল ছেড়ে তাই এগোইনি। এগোতে পারলে হয়ত গোলটা বাঁচত। বাবলুদা (সুব্রত) লাফালেও বল তার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাব্বিরের মাথা ও কাঁধ ছুঁয়ে বল গোলে ঢোকার আগের মুহূর্তেও আমি হাত বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু হাতে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় হাতুড়ির মত ঘা মারতে থাকে দুটি চিন্তা—আমার ফুটবল জীবনটা কি শেষ হয়ে যাবে ? গোলের জন্য কি আমাকে দায়ী করা হবে ?'

তারপর ইস্টবেঙ্গল দুরন্ত আক্রমণের থাবা বাড়িয়ে দিল। এবং তখনই ঘটল সেই ঘটনা—ডেভিডের দুটি দুর্দান্ত সট। বস্তুতপক্ষে প্রথমার্ধের মাঝামাঝি কয়েক মিনিট সময়ই ওর ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিল। এবং মোহনবাগানেরও। ওই দুটি সট রক্ষা করতে না পারলে দলের অবস্থা আরও খারাপ হত। কিন্তু কিভাবে সট দুটি বাঁচাল, ও নিজেই তা জানে কি ?

—'না, সত্যি কিছুটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়েছিল ব্যাপারটা। তবে গোল দুটি সেভ করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই—আর গোল খাবো না। আমার মতে, প্রথমে ডেভিডের নেওয়া মাটি ঘেঁষা সটটাই, যেটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন রকমে বার করে দিয়েছি, বেশী মারাত্মক ছিল যদিও দ্বিতীয় সটটায় জোর ছিল বেশী।'

—১৭ মিনিটে গোল খেয়ে প্রথমার্ধ শেষ হবার একটু আগে মোহনবাগানের পক্ষে গোলটা শোধ হল। গোলের সম্ভাবনা সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি মনে হয়েছিল তোমার ?

—'চিন্ময়ের ব্যাকপাস করার মুহূর্তে ব্যাপারটা তেমন বুঝিনি। কিন্তু যেই চোখে পড়ল মানস স্পিড নিচ্ছে, তখন মনে হল—হ্যাঁ, চান্স

ফিফটি-ফিফটি। এবং তারপর, পঞ্চাশ ভাগ চান্সকে গোলে রূপান্তরিত করল মানস নিজের কৃতিত্বে। আমার তখন আনন্দে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল মাঠে। নিজেই জানি এই ষোল-সতেরো মিনিট কি ভীষণ সময় কাটিয়েছি আমি।'

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হল। মিনিট দশেক কাটবার পর থেকেই ও ক্ষণে ক্ষণে গোল লাইনের ধারে বসা ফটোগ্রাফারদের জিজ্ঞেস করেছিল—আর কতটা সময় বাকি? এখন ক মিনিট?

—'কারণ' ও নিজেই বলছে—'তখন সময়টাকে বড্ড বড় মনে হচ্ছিল, যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। কেবল ভাবছিলাম—খেলাটা কখন শেষ হবে। ভাবনা ছিল—যদি আমার বিপক্ষে আর একটা গোল হয়ে যায়, টিম হারবে এবং লিগ থেকে পিছিয়ে যাবে। তাই আমার একটাই প্রার্থনা ছিল—হে ঈশ্বর, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত গোলটাকে যেন আমি নিরাপদ রাখতে পারি।'

পেরেছিল। যখন খেলা ভাঙল, ফল ১-১। আকাশের দিকে মুখ করে ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভাসিয়ে দিল এবং ফিরে এল বীরের মত। এরপর থেকে মোহনবাগান-গ্যালারির সহানুভূতি ও ভালবাসা পেল ও—প্রতাপ ঘোষ। প্রতাপকে নিয়ে প্রথমেই আমি ৭ জুলাই থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘুরে এলাম, কারণ, এব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না. এই বিশেষ দিনটাই ওর ফুটবল জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।

অতঃপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে ঠিক বত্রিশ দিন পেরিয়ে চলে এলাম ৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবারে। সেদিন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের, পাঁচদিন আগে মহমেডানের সঙ্গে ম্যাচ ড্র রেখে ইস্টবেঙ্গল লিগ থেকে ছিটকে গেছে। মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথ হয়েছে প্রশস্ত। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর দ্বিতীয়ার্ধের ১৯ মিনিটে দেওয়া একমাত্র গোলে মোহনবাগান জয় পেয়েছে। কিন্তু তার আগে, প্রথমার্ধে যা ঘটতে যাচ্ছিল, মনে আছে?

অবশ্যই, প্রতাপের তা মনে থাকারই কথা। খেলার তখন ২৬ মিনিট। একটা থরহরি কম্পনে গোটা মাঠ দুলে উঠল। গৌর বাগের পায়ে বল, সামনে শুধু প্রতাপ। গৌরের পা থেকে ছিটকে বেরোলো চাবুকের মত সট। অসামান্য দক্ষতায় প্রতাপ সেটা ফিস্ট করল। বল চলে এল কিশোর মুখার্জির পায়ে। দাঁতে দাঁত চেপে মোহন-সমর্থকরা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত গুনছেন—গেল বোধহয়। মুহূর্তের মধ্যে কিশোরের পা থেকে সট ছুটল—যতটা সম্ভব ততটা জোরেই। কিন্তু এবারও দুর্দমনীয় প্রতাপ ফিস্ট করে বলটা বার করে দিল। নিশ্চিত গোল খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল মোহনবাগান। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে লাগল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর, বিরাট অভিনন্দন-ধ্বনিতে ফেটে পড়ল সারা মাঠ। মনে রাখতে হবে খেলার ফল ছিল সে সময় গোলশূন্য, শেষ অবধি মোহনবাগান ম্যাচটা জিতেছিল নামমাত্র গোলে এবং তখন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে পয়েন্টের তফাৎও ছিল মাত্র এক। মোহনবাগান গ্যালারি উচ্ছ্বসিত হয় ওদের গোলকিপারকে নিয়ে।

এবার প্রতাপকে আমি ৭ জুলাই এবং ৯ আগস্টের মাঝখানের সেই বিশেষ দিনটি অর্থাৎ ২১ জুলাইতে পৌঁছে দিলাম। মোহনবাগান সেদিন এক গোলে মহমেডানকে হারিয়েছিল। আরও দুটি গোল করতে পারত। কিন্তু সমাপ্তির মিনিট দেড়েক আগে লতিফুদ্দিনের নেওয়া সটটি যদি ক্রসপিসে না লেগে গোলে ঢুকত, তবে সে গোল শোধ দেওয়ার সময় মোহনবাগানের ছিল না। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—লতিফুদ্দিনের সটটা গোলের মধ্যে থাকলেই কি গোল হত? উত্তরটা যে সবচেয়ে ভালোভাবে দিতে পারে, আমার সামনে খাটের উপর শরীরটা সামান্য এলিয়ে বসে আছে সে—প্রতাপ ঘোষ। প্রতাপ এতক্ষণ ধরে কখনো খাটের উপর পা দুলিয়ে বসে এবং অধিকাংশ সময়তেই খাটের উপর কখনো পা মুড়ে বসে, দেহটা ডাইনে—বাঁয়ে হেলিয়ে, মাঝে মধ্যে হাত নেড়ে কপালে ও মাথার চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে এবং কখনো পিছনের বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে একের পর এক আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, সহজভাবে, শান্ত স্বরে। ওর কথায় বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। প্রতাপ বলছে—'লতিফুদ্দিন যে সটটা করেছিল, আমি শেষ পর্যন্ত সেটা ফলো করেছিলাম। গোলের মধ্যে থাকলে নিঃসন্দেহে সেই সটে আমি হাত লাগাতে পারতাম। তারপরে কি হত, বলতে পারি না। কারণ বলটা গোলে ছিল না, ক্রসপিসে লেগে উড়ে যায়।

এরপর আমরা ফিরে গেলাম ৭ জুলাইয়ের আগের দিনগুলোতে। মহারণের আগে পর্যন্ত প্রতাপ একটি মাত্র গোলই খেয়েছিল। গোলটি খিদিরপুরের অমিত বাগচীর দেওয়া। প্রতাপের মতে—ওর বিপক্ষে এবারের লিগ মরশুমে যে চারটি গোল হয়েছে, ওই গোলটিই তার মধ্যে সেরা। তবু মোহনবাগান গ্যালারি মোহন-ইস্ট ম্যাচের আগে ওর প্রতি তেমন আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। ওর কিছু ত্রুটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনাও হয়েছিল। কিন্তু একজন ওর উপর কখনো আস্থা হারাননি—প্রদীপ ব্যানার্জি। সেই দৃশ্যটা এখনো এই কলমচীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেদিন আমি মাঠের মধ্যে পি কে-র কয়েক গজ বাঁ পাশে বসে খেলা দেখছিলাম। ডেভিডের সেই গোলার মত সটটা অসামান্য নৈপুণ্যে প্রতাপ যখন-ফিরিয়ে দিল, এক ঝটকায় ঘুরে যেতে দেখলাম পি কে-কে। এবং কয়েকজনকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম, 'দেখ, দেখ—আমি বলেছিলাম না! দেখলে তো, প্রতাপ আজ ম্যাচ সেভিয়ার। কি বল ও ফিরিয়ে দিল……কি গোল বাঁচাল!'

প্রতাপের কথায়—'মোহনবাগানের লিগ জয়ের মূলে প্রদীপদা'র অবদান অনস্বীকার্য। এবার উনি আমাকে সামনে রেখে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন। অনেকেই হয়ত ওর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন আমাকে রেগুলার খেলানোর জন্য। প্রদীপদা দেখিয়ে দিতে চাই-ছিলেন, তার সিদ্ধান্ত ভুল নয়। চাইছিলেন, আমার উপর তার আস্থার সত্যতা যেন প্রমাণ করতে পারি। আমি সেটা পেরেছি। এবং তাতে আমি যতটা আনন্দিত, প্রদীপদা তার চাইতেও বেশী।'

সত্যিই তাই। আর শুধু প্রদীপ ব্যানার্জিই কেন, দলের সিনিয়র খেলোয়াড়রাও এতে আনন্দিত। তারা ওকে সর্বদা উৎসাহিত করেছে। কোন সংশয় না রেখেই বলা যায়, প্রথমবার বড় টিমে এসেই দলের লিগ জয়ের পথে সে বিরাট অবদান রেখে গেছে। এবং আরও কৃতিত্বের, গতবারের এক নম্বর গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জি দলে থাকা সত্ত্বেও এবছর দলে নতুন আসা প্রতাপই উঠে এসেছে এক নম্বর স্থানে। একটি ম্যাচ ছাড়া শিবাজী এবারের লিগে খেলেইনি। মোহনবাগান প্রতাপকে দলে নিয়েছে ভেবেচিন্তেই এবং মনে হয় রেগুলার খেলাবার কথা মাথায় রেখেই।

সোনারপুর স্টেশন থেকে রিকশ'য় চেপে প্রতাপের বাড়ি যাওয়ার পথে ট্রেনে আলাপ হওয়া সোনারপুর নিবাসী ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ফিফথ ইয়ারে পড়া এক যুবক বলছিল—'প্রতাপকে আমি চিনি। এবছর লিগে ওর খেলাও দেখেছি, দারুণ খেলেছে। তবে মাঝে মাঝে ওর গ্রিপিংয়ে ত্রুটি দেখা গেছে। আগে অবশ্য এটা তেমন ছিল না।'

সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলে প্রতাপের বাড়িতে বসে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেই অকপটে ও স্বীকার করল—'হ্যাঁ, মানি, আমার গ্রিপিং ততটা ভালো নয়। তবে একজন গোলকিপারের কম করেও যতটা দরকার, তা আছে। আর বুঝতেই পারছেন, এতো ছোট বা মাঝারি টিমে নয়, মোহনবাগানের হয়ে খেলা। টেনশন, নার্ভাসনেস ইত্যাদি ব্যাপারগুলো রয়েছে এখানে। তাই আমি গ্রিপ করার দিকে



বেশী ঝুঁকিনি। ভয় ছিল, যদি ফস্কে যায়। তবে দেখবেন, সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা কাটিয়ে উঠতে পারবোই। প্রমাণ করব গ্রিপিংয়েও আমার ত্রুটি নেই।'

আমরা যে ঘরে বসে কথা বলছিলাম সে ঘরের দেওয়ালে '৭৭ এর কলকাতা ন্যাশনালের একটি ছবি টাঙানো ছিল। ছবিটি বাংলা-রেলের প্রথম লেগ সেমিফাইনালের গৌতমের একটি ফ্রি-কিক সট শূন্যে লাফিয়ে উঠে ফিস্ট করে বারের উপর দিয়ে তুলে দিচ্ছে প্রতাপ, অবশ্যই একটি অনবদ্য সেভ।

এই '৭৭-এর কলকাতা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা (প্রতি-যোগিতায় আসর অবশ্য বসেছিল '৭৮-এর ৯ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি) থেকেই প্রতাপ উঠে আসে।

গত বছর ইস্টবেঙ্গল ওকে ডেকেছিল। প্রতাপও রাজী ছিল যেতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কারণ, চাকরি ছেড়ে অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াতে ও ইচ্ছুক ছিল না। ইস্টবেঙ্গল ওকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা করে দিতে পারবে, এমন কথা দিতে পারেনি।

গতবার কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল, '৭৯ অর্থাৎ এবারের মরশুমে মোহনবাগান ওকে ডাকবে। এবং ডেকেছেও। '৭৮-এর রোভার্সে প্রতাপের অনবদ্য খেলা দেখেই মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ ওকে পাকা কথা দেয়, তোমাকে নেব। কোচ পি কে-রও ব্যক্তিগত অভিমত ছিল, বলাবাহুল্য, প্রতাপেরই অনুকূলে। দলে আরও দুজন গোলকিপার থাকা সত্ত্বেও ওর ধারণা হয়েছিল, চান্স পাবে ও।

এদিকে বি এন রেল কর্তৃপক্ষ প্রতাপকে লোয়ার ডিভিসন থেকে আপার ডিভিসন ক্লার্কের পদে প্রমোশন দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আগেই মনস্থির করে ফেলেছে পা বাড়াবার। মোহন-বাগান ওকে তিন মাসের মধ্যে চাকরি করে দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। অতএব বি এন আর ওকে পদোন্নয়নের প্রস্তাব দিয়েও আটকে রাখতে পারল না। ওর চোখের সামনে তখন সোনালী আশা ঝিকমিক করছে।

স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে প্রতাপ এখন চাকরি করে। '৭২-এ মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিপক্ষে ২৪ পরগণার হয়ে আই এফ এ শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে দারুণ গোলকিপিং করায় '৭৩-এ টালিগঞ্জ অগ্র-গামীর হয়ে ওর খেলার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। সেই ওর প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগে পদার্পণ, এক লাফেই। মনে আছে নিশ্চয়ই, '৭৩-এ টালিগঞ্জ অগ্রগামী সুপার লিগ খেলেছিল। '৭৫ পর্যন্ত এই দলে কাটিয়ে '৭৬-এ ও আসে বি এন আরে। এবং এখানেও প্রতাপ তিন বছর কাটায়। '৭৭-এর কলকাতা এবং '৭৮-এর কাশ্মীর ন্যাশনালে রেলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ও। তবে একবারের জন্যও জুনিয়র বাংলা বা যুব ভারতীয় দলে প্রতাপ সুযোগ পায়নি। চার বার ট্রায়ালে ডাকা হলেও জুনিয়র বাংলা দলে প্রতাপ নির্বাচিত হয়নি একবারও।

প্রতাপকে আবার দ্রুতগতিতে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। ও উত্তর দিয়ে গেল। এবারের লিগে ওর বিপক্ষে যে চারটি গোল হয়েছে তার মধ্যে—ও স্বীকার করল—'এরিয়ানের গোলটার জন্য আমি দায়ী।' দু'প্রধানের আবার দেখা হলে কি হত, এই প্রশ্নে ওর বক্তব্য—৭ জুলাই মোহনবাগান ভাল খেলতে পারেনি। আবার দেখা হলে লড়াইটা জমত মনে হয়।' প্রতাপের মতে এখন ভারতের সেরা গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলি। সনৎ শেঠ ওর আদর্শ। টেলিভিশনের পর্দায় ফিলোলের গোল রক্ষা দেখে ও আশ্চর্য হয়ে গেছে। ছোটবেলায় খেলার মাঠে ও লেভ ইয়াসিন সাজত—এক যুবক বলল।

প্রতাপের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন একটা ছোটোখাটো ভিড়ই হয়ে গেল। ওরা কেউ প্রতাপের জ্যাঠতুতো, কেউ খুড়তুতো, কেউ মামাতো ভাই। আবার কয়েকজন প্রতাপের বন্ধু। প্রতাপরা



চার ভাই। ও মেজ। পরের দু'ভাইও গোলকিপার। ছোটভাই প্রদীপ এবার টালিগঞ্জে নাম লিখিয়েছে। বড়দাও একসময় খেলতেন। ওদের পরিবারই যেন একটা পাড়া, ক্লাব। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো-মামাতো ভাইদের নিয়েই একটা টিম হয়ে যায়। বিরাট বাড়ি। জ্যাঠা, কাকা, মামা—সকলেরই অবস্থান এক জায়গায়। সদস্য সংখ্যাও অনেক। সবসময় গমগম করে বাড়িটা।

টুকুন (প্রতাপের বাড়ির নাম) ওদের সকলের গর্ব, গর্ব সোনারপুরের। প্রতাপ সম্পর্কে অনেক তথ্য ওরাই জানিয়ে দিল। কেউ বলল—ও ভলিবলও যথেষ্ট ভাল খেলে এবং আমাদের সঙ্গে ফুটবলে গোলে না খেলে এগিয়ে খেলে এবং গোল করে।' কেউ জানাল—ও রাজপুর বিদ্যানিধি হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছে। কেউ আবার বলল—ও বাড়ির দেওয়ালে বল ছুঁড়ে এবং সট করে ফিরতি বল ধরে প্র্যাকটিস করে। একজন খবর দিল—যেদিন খেলা না থাকে, সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে ও। এমনিতে খেলা সমেত অন্য গল্পের বই পড়ে, খেলার রিলে শোনে এবং আমাদের সঙ্গে গল্প করে, আর যায় গুরুর কাছে। চিন্ময়ের যেমন কালীদা, তেমনি ওর গুরু অশোক চক্রবর্তী। প্রতিদিন ও তার কাছে যায়, খেলার দিন আশীর্বাদ নিতে তো বটেই। গুরু ওর মঙ্গল কামনায় পুজো আর্চা করেন।

বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সংঘও প্রতাপের জন্য গর্বিত। এই ক্লাবেই ওর ফুটবল খেলা শুরু। প্রতাপের জন্মও সোনারপুরেই। অল্প বয়স থেকেই সকলের সঙ্গে ও খেলা শুরু করে। তবে ও বল নিয়ে পেটানো বা ছুটোছুটি করত না, তিনকাঠির নীচে দাঁড়িয়ে ধেয়ে আসা বলগুলো ফিরিয়ে দিত। দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল বেশ। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাপাত। '৬৯ সালে, মাত্র ১৪ বছর বয়সে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল প্রতাপ। ওর বাবা মারা গেলেন। বাবা খেলাধুলো ভালোবাসতেন এবং ছেলেকে উৎসাহিতও করতেন। তার বিয়োগে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ওরা। সংসারের হাল ধরল তখন বড়দা প্রভাস ঘোষ, মা আগলে রাখলেন ছেলেদের, এছাড়া সবসময় ওরা উত্তোলিত থাকল আত্মীয় পরিজনের এবং শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসা, শুভেচ্ছায়। প্রতাপ সেকথা বলেও। সোনারপুরের অজয় সরকার, পঙ্কজেন্দু ঘোষ, সুভাষ মজুমদার এবং ময়দানে মণ্টু ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ ওর ক্লাবের কাছেও। প্রতাপের ক্লাবে যাওয়ার পথে ওর বাড়ির উঠোনে গোটা বারো সাইকেল এবং একটি মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমরা আসার পর এগুলো জড়ো হয়েছে। এগুলোর মালিকদের কারোর কাছে প্রতাপ 'টুকুন', কারোর কাছে 'টুকুনদা'। ওরা কিছু ঘরে এবং কিছু বারান্দায় বসে খেলাধূলার আলোচনায় মশগুল ছিল। আসলে এই খেলাধূলার পরিবেশটাই প্রতাপের বাড়িটাকে জীবন্ত করে রাখে। কথা প্রসঙ্গে ও জানাল—'হ্যাঁ, সবচেয়ে ভীতিপ্রদ অফেণ্ডার নিঃসন্দেহে সুরজিত সেনগুপ্ত।'

প্রতাপের বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। এই ফাঁকে ওর একটি গুণেরও হদিশ পেলাম—ভাল হাত দেখতে পারে ও। পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি লম্বা প্রতাপের ওজন ৫৭ কেজি—একটু কমই।

ফেরার পথে ওর একটি কথা মনে পড়ল। প্রতাপের বয়স এখন চব্বিশ। এদিন ও যেমন বলেছে, ভাস্কর ভারতের সেরা গোলকিপার, তেমনি আশা করতে পারি—আজ থেকে হয়ত পাঁচ বছর বাদে কোন তরুণ গোলরক্ষক আমাকে ইণ্টারভ্যু দিতে গিয়ে বলবে—আমার মতে ভারতের এখন শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষ।



দক্ষিণ কোরিয়াকে রুখতে এরিয়ান / অরুণ মুখার্জি

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে এরিয়ানের জমাটি লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৯ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দুর্বল প্রতিরোধের বিপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়া অনায়াসে ৬-০ গোলে জয় পেলেও কোয়ার্টার ফাইনালে এরিয়ান ওদের তীব্র লড়াইয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। দীর্ঘ ৭০ মিনিট পর্যন্ত কোরিয়া দলকে আটকে রেখেছিল গোল পাওয়া থেকে। কিন্তু দু'মিনিটে পর পর দুটি গোল দিয়ে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচ জিতে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ওরা দুর্দান্ত খেলেছে, সন্দেহ নেই। দলের দক্ষ খেলোয়াড় কিম হং সুপ এই অর্ধে মাঠে নামে।

প্রথম গোলটি হয় ৭১ মিনিটে; দেখবার মত গোল। আউটের খেলোয়াড় চৈ সাং জেং ডান প্রান্ত ধরে এগিয়ে গিয়ে একটি নিখুঁত সেন্টার করে। সেন্টারটি বক্সে আসা মাত্র হা তাই বং শূন্যে দেহ ভাসিয়ে অপূর্ব ক্ষিপ্রতায় হেড করে বল জালে পাঠিয়ে দেয়। এমন সুন্দর এবং চকিত গোল খুব একটা আমরা দেখতে পাই না। দর্শকরা হাততালি দিয়ে গোলটার জন্য হা তাই বংকে অভিনন্দন জানায়।

এক মিনিট পরেই দ্বিতীয় গোল। বাঁ দিকে পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে কিম হং সুপের প্রচণ্ড গতির সটটি জগদীশ ঘোষ ঠিক মত ফিস্ট করতে পারে না। বল গোলে ঢোকে। গোলটির জন্য অবশ্যই জগদীশ দায়ী। লাফিয়ে উঠে ফিস্ট করতে গিয়ে সে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এবং কাত হয়ে যায়। তাই ঠিক জায়গায় দুটি হাত রেখে বলটাকে সে থামাতে পারে না। বল তার হাতে লেগে পোস্ট ঘেঁষে গোলে ঢোকে। দাঁড়িয়ে ফিস্ট করলে, মনে হয়, দুর্দান্ত হলেও এ সট থেকে গোল হত না। জগদীশ অবশ্য কয়েকটি গোল বাঁচিয়েছে।

কোরিয়া দল এদিন দ্বিতীয়ার্ধে সত্যিই ভালো খেলেছে। ওদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ, প্যাসিং, বোঝাপড়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং সবচেয়ে বড় গুণ যেটা, তা হল, যে কোন জায়গা থেকে ওরা গোলে সট নেয়। সটগুলো বিপজ্জনকও বটে।

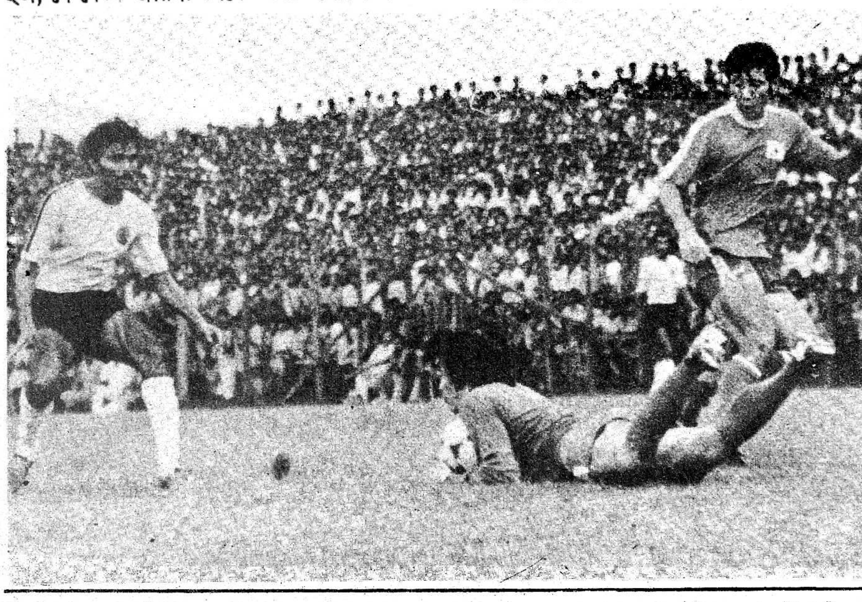
এরিয়ান রক্ষণ রীতিমত দাপটের সঙ্গে যুজেছে। সমীর মুখার্জি অসাধারণ খেলেছে। মনে পড়েছে, এই সমীর গত বছরের শিল্ড সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আরারাতের বিপক্ষে অনবদ্য খেলেছিল। এছাড়া লেফট স্টপার সমীরণ সাহা ও লেফট ব্যাক প্রাণ গোপাল দাসও লড়েছে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে। যোগ্য সহায়তা দিয়েছে প্রাণগোপাল দাস। প্রকৃতপক্ষে এরিয়ান প্রথমার্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে গোলের উপযুক্ত তেমন কোন সুযোগ তৈরী করে নিতে দেয়নি। শুধু একবার ওরা গোল প্রায় করে ফেলেছিল, সমীর মুখার্জি সে যাত্রা গোলে ঢুকতে থাকা বলটা বার করে দিয়ে দলকে উদ্ধার করে নিশ্চিত বিপদ থেকে।

মাঝে মাঝে এরিয়ান আক্রমণও করেছে। যা থেকে গোলও হতে পারত। প্রথমার্ধে এরিয়ান একটি গোল দিয়েওছিল, কিন্তু অফসাইডের জন্য সে গোল নাকচ হয়ে যায়। তবে একটা কথা, এরিয়ান ফরোয়ার্ডরা অযথা পায়ে বেশীক্ষণ বল রাখছিল। আক্রমণকেও যা শ্লথ করে দেয়।

দক্ষিণ কোরিয়া—ইউন জং বুন, হাওয়াং জন ইউন, হ্যান মুন বে, কিম চুল সু, কিম জং সু (কিম হং সুপ), চিন ইয়ং গিল, সন জং সুক, হা তাই বং, ইউন মিউং ইউল (ইউং চুল জুং), লি ইউন হো, চৈ সাং জেং।

এরিয়ান—জগদীশ ঘোষ, প্রাণগোপাল দাস, সমীর মুখার্জি, সমীরণ সাহা, বলাই মুখার্জি, দীপক ব্যানার্জি, প্রবীর ঘোষ, (মোতি সিং), শঙ্কর অধিকারী, বিশ্বজিত ভট্টাচার্য, দেবাশিস রায় এবং নির্মল চ্যাটার্জি।

রেফারি—রবি চক্রবর্তী।

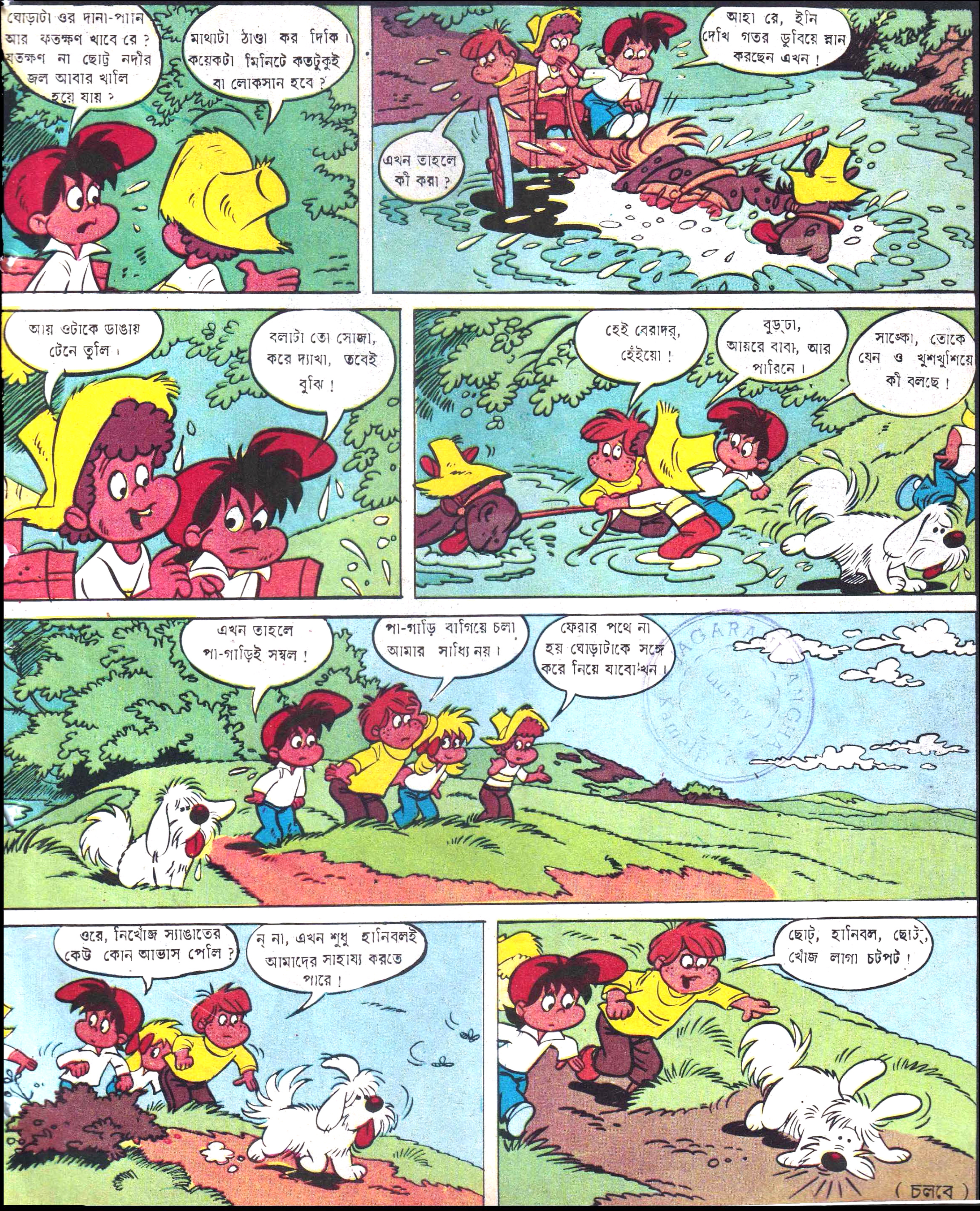


দক্ষিণ কোরিয়ার গোলমুখে এরিয়ানের হামলা / শঙ্কর

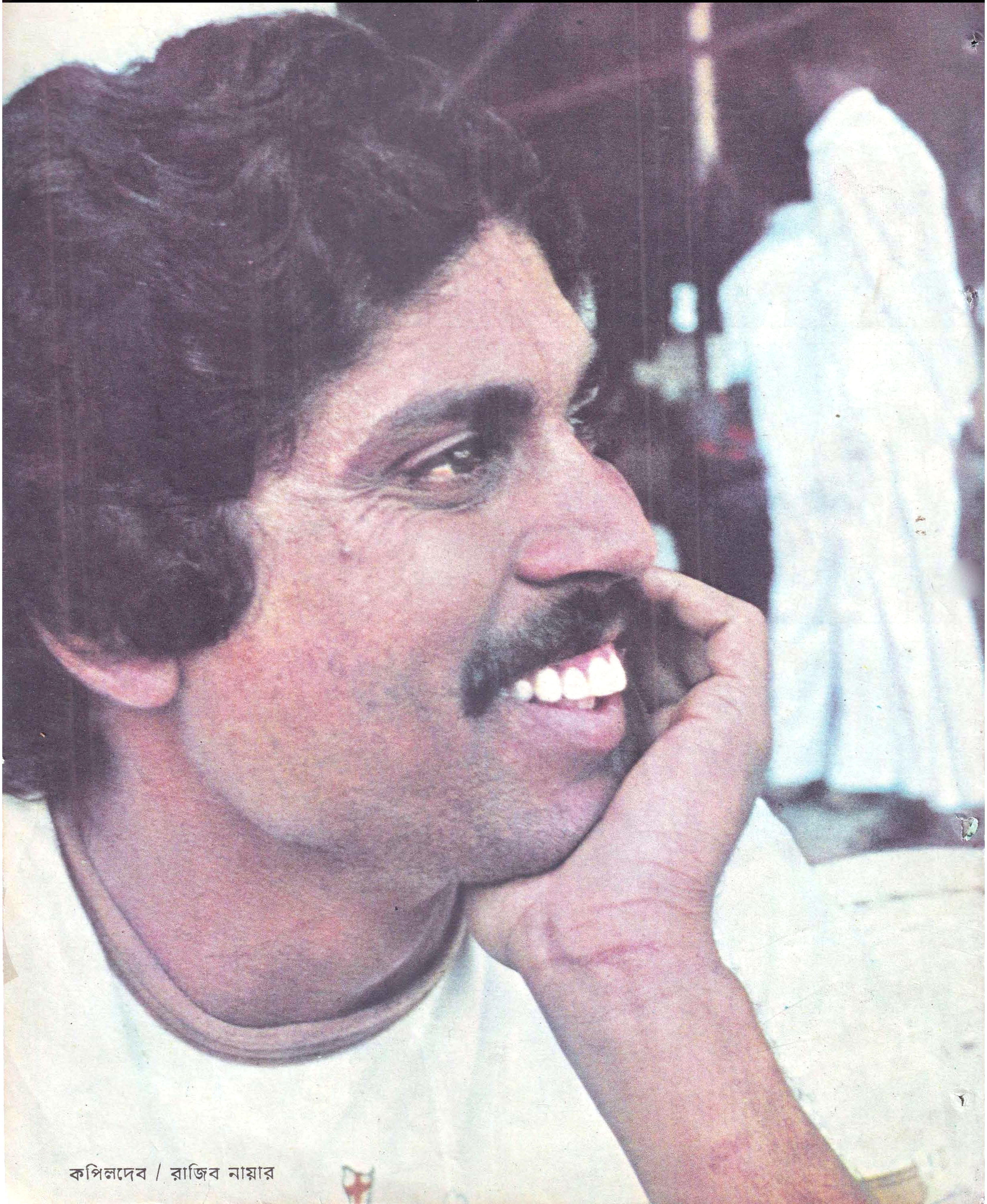
মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

জয় ফুটবল জয়

আলেখ্য ঃ ভাল্টার নয়গেবাউয়ার,
অনুবাদ ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 21st September 1979. WB/CC—334/77 Rs. 1.50



কপিলদেব / রাজিব নায়ার